ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

৬১ বর্ষ ৩১ সংখ্যা ।। ২৩ চৈত্র, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ৬ এপ্রিল, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

কেরল

সিপিএমের হত্যার রাজনীতি চলছেই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। পার্টির সেক্রেটারি পিনারাই বিজয়নের বিরুদ্ধে বহু কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ এবং শরিক সিপিআই-এর সঙ্গে মন কষাকষি যখন তুঙ্গে, তখন সিপিএম গা বাঁচাতে কেরলে

তাদের সেই পুরনো কৌশলকেই আঁকড়ে ধরেছে। লাল দুর্গ বলে পরিচিত কান্নুরে আর এস এস-এর স্বয়ংসেবকদের খুনে মেতে উঠেছে। সম্প্রতি শশাঙ্কন ও সত্যেশ নামে আর এস এসের দুই স্বয়ংসেবক সিপিএম ক্যাডারদের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়ে পারিয়ারাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। এই জেলায় রাজনৈতিক বিরোধীদের পুরোপুরি মুছে দিতে সিপিএম বহুদিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে আসছে। রাজ্যের ক্ষমতার রাশ হাতে থাকলেও সিপিএম এখন আর এস এসের বিরুদ্ধে তাদের হত্যার রাজনীতিতে সান দিচ্ছে।

পুলিশেরই মদত নিয়ে সিপিএম ক্যাডাররা তাদের এই হত্যার রাজনীতি নির্বিবাদে চালিয়ে যাচ্ছে। খোদ রাজ্যের

(এরপর ৪ পাতায়)

বরুণকে ফাঁসাতে তিল থেকে তাল

কংগ্রেসকে টেক্কা দিতেই মায়াবতীর চাল

গূঢ়পুরুষ ।। একেবারে তিল থেকে তাল। অভিযোগ ছিল, বরুণ গান্ধী পিলভিটে তাঁর সংসদীয় নির্বাচিত কেন্দ্রে বিজেপি কর্মী সভায় সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিয়েছেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনের ধারায় স্থানীয় পুলিশ মামলা দায়ের করে। বরুণ জানায় যে তাঁর বক্তৃতায় যে ক্যাসেটটি পুলিশ আদালতে প্রমাণ হিসাবে দাখিল করেছে, সেখানে এমনভাবে তাঁর মুখে কথা বসানো হয়েছে যা তিনি বলেননি। এমনভাবে কাট-ছাঁট করা হয়েছে যে তাঁর বক্তব্যটির প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে গেছে। যেমন, বরুণের দাবি তিনি বলেছিলেন পিলভিটে সম্প্রতি তিন জন হিন্দু মহিলাকে বলাৎকার করা হয়েছে। নানা ছুতোয় হিন্দুদের সম্পত্তি ও সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা চলেছে। তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন, হিন্দুদের কেউ যদি দুর্বল মনে করে এই আঘাত করে তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে হিন্দুরা মোটেই দুর্বল শক্তিহীন নয়। হিন্দুদের প্রতি আঙুল তুললে সেই হাত কেটে দেওয়ার শক্তি বরুণ গান্ধীর আছে। ক্যাসেটে হিন্দু মহিলাদের উপর বলাৎকারের যে ঘটনার তিনি উল্লেখ করেছিলেন সেই প্রসঙ্গটি ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। বরুণের দ্বিতীয় দাবি, তিনি কোথাও মুসলিম বা কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছিলেন, 'ভোট কাটুয়াদের' ব্যবহার করে নির্বাচনে সব সময় বাজিমাৎ করা যায় না। ক্যাসেটে 'ভোট কাটুয়া' কথাটি থেকে 'ভোট' ছেঁটে শুধু কাটুয়া কথাটি রাখা হয়েছে। তাই আদালতে পেশ করা তাঁর বক্তৃতার ক্যাসেটটি জাল। অথবা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ডকটরড্'। এরপর গ্রেফতারি এড়াতে তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হলে তিনি পিলভিটের আদালতে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন এবং আদালতের নির্দেশে জেল হেফাজতে যান। এই ঘটনাকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে প্রতিবাদ জানিয়ে স্থানীয় মানুষজন জেলের বাইরে বিক্ষোভ দেখালে

পুলিশ লাঠি গুলি চালিয়ে বিক্ষোভকারীদের হঠিয়ে দেয়।

বরুণ গান্ধী এবং বিজেপি যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার তা বোঝাতেই সকলেরই জানা ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল বরুণকে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে না দেওয়া। কংগ্রেস চাইছে যে সোনিয়া নন্দন রাহুলকে দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তুলে ধরতে। বরুণ যদি নির্বাচিত হয়ে সাংসদ হয় সেক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধীর দুই নাতির শিক্ষা, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের তুলনা হবেই। সেক্ষেত্রে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্ থেকে মাস্টার ডিগ্রি পাওয়া বরুণ অর্ধ শিক্ষিত রাহুলের থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। তাছাড়া সোনিয়া — মানেকার শত্রু সম্পর্ক সকলেরই জানা আছে। সোনিয়া কোনওমতেই বরুণের উত্থান বরদাস্ত করবেন না। সোনিয়ার মোসাহেব স্তাবকেরা রাজনীতিতে নবাগত বরুণকে ফাঁসাতে ষড়যন্ত্র রচনা করেছে বলেই সন্দেহ করা হচ্ছে। ষড়যন্ত্রকারীরা ভেবেছিল যে মুসলিম বিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে বরুণকে গ্রেফতার করা হলে দেশের মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক কংগ্রেসের দখলে চলে আসবে। কিন্তু কংগ্রেসের সেই আশায় এখন ছাই দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের দলিত নেত্রী মায়াবতী। কংগ্রেস এবং বিজেপি দুই-ই মায়াবতীর রাজনৈতিক শত্রুদল। এক ঢিলে দুই শত্রুকে মারতে তিনি আগ্ বাড়িয়ে বরুণকে দীর্ঘকাল জেলে আটক রাখতে তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয় সুরক্ষা আইনের প্রয়োগ করেছেন। এই আইনে আটক ব্যক্তি ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে আদালতে জামিনের আবেদন জানাতে পারে না।

প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। বরুণ গান্ধী কী সন্ত্রাসবাদী যে তাঁকে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখতে হবে। বরুণের সমর্থনে এবং তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে স্থানীয় মানুষজন বিক্ষোভ দেখালে তার দায় জেলে আটক বরুণ গান্ধীকে নিতে হবে কেন? গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভ জানানোর সাংবিধানিক অধিকার

(এরপর ৪ পাতায়)

রাজ্যে ছয় জেলায়

আফিং চাষের রমরমা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অন লাইন লটারি, চোলাই মদের কারবারে রাজ্য এতদিন প্রথম সারিতেই ছিল, এবার আফিম চাষেও দেশের মধ্যে শিরোপা লাভের পথে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের পাঁচ-

ছটি জেলায় গত কয়েক বছরে যেভাবে আফিম চাষ বাড়ছে তাতে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার। বারবার চিঠি লিখে বেআইনি আফিম চাষ বন্ধের জন্য বললেও রাজ্য সরকার তাতে বিশেষ উচ্চ্যবাচ্য করছে না। যে জেলাগুলিতে আফিম চাষের রমরমা সেগুলি বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা। কিংবা সেই জেলাগুলি থেকে ভিন রাজ্যে আফিম পাচারের সুবিধা রয়েছে। কেন্দ্রীয় নারকটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর প্রধান রাজ্যের কর্তাদের সতর্ক করে বলেছেন, এরাজ্যে চাষ হওয়া আফিম ভিন রাজ্যে পাচার হচ্ছে। আবার বাংলাদেশ নেপাল হয়েও প্রচুর আফিম এরাজ্যে ঢুকছে। পুলিশ যদি তৎপর না হন, তাহলে আফিম চাষ রাজ্যের অন্যতম সমস্যা হতে চলেছে। আফিমের কারবার এখনই বন্ধ করা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে রাজ্যকে চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে গত কয়েক বছর ধরে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলায় আফিম চাষের রমরমা বাড়ছে। এই জেলাগুলির প্রায় ২০০ গ্রামে আফিম চাষ হচ্ছে। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সেসব ছবিও তোলা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, জলপাইগুড়িতে যেসব এলাকায়, আফিম চাষ হচ্ছে তা বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা। অন্যদিকে বীরভূম, বর্ধমান এবং কোচবিহারে আফিম চাষের এলাকাগুলি ঝাড়খন্ড এবং অসম সীমান্তের কাছে। এর

(এরপর ৪ পাতায়)

অর্ধেকেরও বেশি আসন খোয়ানোর আশঙ্কায় সিপিএম

অর্ণব নাগ ।। ভোটের ঢাকে কাঠি পড়তেই আলিমুদ্দিনের ভোট ম্যানেজারদের মধ্যে এখন তুমুল ব্যস্ততা। তবে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিরীখে স্রেফ পাটিগণিতের অঙ্কই তাদের আদৌ স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। সেই সঙ্গে বহু নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর পরবর্তী পরিস্থিতিতে পার্টি যে নির্বাচনে বেশ বেকায়দায় পড়বে এই আশঙ্কাও তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাদের। রিগিং আর ইভিএমে কারচুপি অন্যান্যবারের মতো এবার ড্যামেজ কন্ট্রোল কতটা করতে পারবে সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দিহান আলিমুদ্দিনের কর্তাব্যক্তিরা।

সি পি এমের অভ্যন্তরীণ সূত্রের খবরানুযায়ী বিরোধী জোট তৈরির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর তাদের ভোট ম্যানেজারেরা আসন পুনর্বিন্যাসের পরবর্তী পর্যায়ে ব্যস্ত। তারা সেই ডিলিমিটেশনের ভিত্তিতে ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত ভোট এবং ২০০৬ সালের বিধানসভায় প্রাপ্ত ভোটের পরিপ্রেক্ষিতে এবারের লোকসভা নির্বাচনের আসনগুলিতে স্রেফ পাটিগণিতের হিসেবে করেছেন। অর্থাৎ বামফ্রন্টের ভোট এবং কংগ্রেস ও তৃণমূলের মিলিত বিরোধী ভোটের তুলনামূলক পারসেনটেজ ভোটের হিসেব করেছেন। আর তা করতে গিয়ে যে হিসেব বেরিয়ে পড়েছে তা পার্টি নেতাদের কপালে উদ্বেগের গভীর ভাঁজ ফেলেছে। সেই হিসেব অনুযায়ী দক্ষিণ বঙ্গের ১১টি আসনে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আসনগুলি হল — হাওড়া, উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, যাদবপুর, তমলুক,

কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বনগাঁ, ডায়মন্ডহারবার, মথুরাপুর, বসিরহাট। এছাড়া ৫টি আসনে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই-এর আশঙ্কা করছে তারা। আসনগুলি হল বারাসাত, হুগলি, শ্রীরামপুর, কাঁথি ও বীরভূম। এর সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি আসন অর্থাৎ বহরমপুর মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর কেন্দ্রে গত পঞ্চায়েত ও বিধানসভা ভোটের নিরীখে হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা সি পি এম করছে। পার্টিগণিতের হিসেবে উত্তরবঙ্গে যে আসনগুলি হারানোর উপক্রম বলে মনে করছে সিপিএম সেগুলি হল উত্তর মালদা ও দক্ষিণ মালদা। তার সঙ্গে কোচবিহার ও রায়গঞ্জ আসনটিতে জোরদার লড়াই-এ বিরোধীরা সামান্য এগিয়ে থেকেই শুরু করবে বলে সিপিএম-নেতৃত্বের অনুমান। সব মিলিয়ে অন্তত ১৬টি কেন্দ্রে নিশ্চিত হারের এবং ৭টি আসনে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই-এর আশঙ্কায় বিনিদ্র রজনী যাপন করছে সি পি এম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। এর বাইরেও সি পি এম নেতৃত্বের আশঙ্কা নন্দীগ্রাম ও বিষ্ণুপুর (পশ্চিম)-এর উপনির্বাচনে যথাক্রমে ৪০ হাজার ও ৩০ হাজার ভোটের বিপুল ব্যবধানে হারের পর যে প্রবল বামবিরোধী হাওয়া বইছে সারা বাংলায় তার প্রকোপ পুর এলাকা সমৃদ্ধ বেশ কিছু লোকসভা কেন্দ্রও তাদের হাতছাড়া হবে।

এরপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো যোগ হয়েছে সি পি এম বিরোধী জনজাতি আন্দোলন, টিকিট না পেয়ে বিক্ষুব্ধ বামফ্রন্টের গোষ্ঠীকোন্দল এবং পাহাড়ের আন্দোলন যা আরও কমিয়ে দিতে পারে বামফ্রন্টের সামগ্রিক আসন সংখ্যা। ইতিমধ্যে দার্জিলিং আসনটিকে খরচের খাতায় ধরেই রেখেছে পার্টি নেতৃত্ব। সেখানে বিজেপি প্রার্থী দেওয়া শেরপার জয়ের সম্ভাবনা প্রবল। বিমল গুরুং শেষ পর্যন্ত বিজেপি প্রার্থীকেই সমর্থন করবেন বলে রাজনৈতিক মহলের অনুমান। কেননা, গুরুং ভালভাবেই জানেন লোকসভায় জিততে হলে শুধুমাত্র দার্জিলিং, কালিম্পং আর কার্শিয়াং বিধানসভায় এগিয়ে থাকলেই চলবে না, ন্যূনতম জনসমর্থন প্রয়োজন অন্য চারটি বিধানসভা কেন্দ্র — মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া ও

(এরপর ৪ পাতায়)

কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে জাতীয় স্বার্থের জলাঞ্জলি

এন সি দে ।। সোনিয়ার কংগ্রেস দল শেষ পর্যন্ত নিজের ছবিসহ একটি নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করল। ওই ইস্তাহারে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা নির্মাণ, আর্থিক বিকাশ ও রাষ্ট্রের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার কোনও প্রতিশ্রুতি বা সদিচ্ছার কথা নেই। বরং চলতি ও আসন্ন ভয়াবহ আর্থিক সংকটের মোকাবিলার কথা জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমতা দখলের মোহে রাষ্ট্রকে পুনরায় আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে ফেলার চেষ্টা করছে। যেমন, কোটি কোটি টাকার ভর্তুকি ঘোষণা করেছে, তেমনি সংখ্যালঘু অর্থাৎ মুসলমানদের সরকারি চাকুরিতে সংরক্ষণ, তফশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা এবং কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরিতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাষ্ট্রকে ভয়াবহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কটে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে।

ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট চালু করে গরীবী রেখার নীচে বসবাসাকারী মানুষদের তিন টাকা কিলো দরে মাসে ২৫ কিলো চাল অথবা গম দেবে। সঙ্গে সঙ্গে এও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত শহরে গৃহহীন ও অনুপ্রবেশকারীদের (মাইগ্রেন্ট) খাওয়ানোর জন্য লঙরখানা খোলা হবে। এছাড়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারদের স্বাস্থ্যবীমার অধীনে আনা হবে এবং দরিদ্র পরিবারগুলিকে অল্প পয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়া হবে।

এইভাবে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কিন্তু সোনিয়া বা মনমোহনের পকেট থেকে আসবে না। আসবে সরকারি কোষাগার থেকে।

মোটামুটি এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে সরকারি কোষাগার থেকে এর ফলে আরও বাড়তি ৫,৭০০ কোটি টাকা ভর্তুকি হিসেবে চলে যাবে। বর্তমানে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারদের দেওয়া হয় ৫ টাকা ৬৫ পয়সা দরে ২০ কিলো চাল আর দারিদ্র্য সীমার উপরে বসবাসকারী পরিবারদের দেওয়া হয় ১০ টাকা ৩০ পয়সা দরে চাল। বর্তমানে দেশে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে ৫ কোটি। তাহলে কিলোপ্রতি বাড়তি ২ টাকা ৬৫ পয়সার জন্য খরচ হবে আরও ৩,২০০ কোটি টাকা। মোট ভর্তুকির পরিমাণ ১২,৫০০ কোটি টাকা (আনুমানিক)।

এর উপর রয়েছে অনুপ্রবেশকারীদের (মাইগ্রেন্ট) জন্য লঙরখানা খোলার ব্যয়। মুসলমান প্রভৃতিদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যয়। এভাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার ব্যবহারের সুযোগ কী জনগণ কংগ্রেস দলকে দেবে? এটাই এখন দেখার।

এই সময়

চীনা সুর

ব্যর্থতার বাঁকে পড়ে শেষ পর্যন্ত সেই চীনা সুরই পাথেয় করল সিপিআইএম। কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের দোসর হয়ে দেশের উন্নয়ণে যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি শাসন ক্ষমতায় থাকা রাজ্যগুলিতেও সিপিএম সেরকম দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারেনি। এন ডি এ-র পাঁচ বছরের শাসন এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোর উন্নয়ণের সঙ্গে পাল্লা দিতে শেষ পর্যন্ত চীনকেই প্রচারে আনলো সিপিআইএম। সম্প্রতি এক প্রচার পুস্তিকাতে তারা বলেছে, উন্নয়ণের জন্য চীনা মডেলকেই গ্রহণ করতে হবে ভারতকে। এমনকী চীনা গণতন্ত্রই নাকি ভারতের এখন প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, চীনা পণ্য এখন বিশ্বের বহু দেশেই নিষিদ্ধ। খোদ চীনের সমাজ কমিউনিজমের শাসন থেকে মুক্তি পেতে বিভিন্ন আন্দোলনে সামিল হচ্ছে।

সিবিআই না এসবিআই?

ভোটের মুখে জোড় বিতর্ক সিবিআই নাকি এসবিআই। অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন কি কংগ্রেস ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন হয়েছে নাকি সোনিয়া ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন — বিতর্ক এই নিয়েই। আসলে সাধারণ জনমানসে বিশেষ করে শিখ সমাজের কাছে কংগ্রেস নেতা জগদীশ টাইটলার শিখ বিদ্বেষী হিসেবেই চিহ্নিত। ১৯৮০-র দাঙ্গায় তিনি জড়িত বলে বহু কংগ্রেসী নেতা ও কর্মীরা একাধিকবার স্বীকার করেছেন। তথাপি ভোটের মুখে সরকার সি বি আই-কে দিয়ে টাইটলারকে ক্লিনচিট দেওয়াতেই এই বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

নিম্ন রুচি

ভোটের মুখে জঙ্গি সংগঠনকে হাতে রাখতে জঘন্য রাজনৈতিক খেলায় মাতলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। গৌহাটিতে এক নির্বাচনী প্রচার সভায় তিনি বলেন, উলফা সংগঠনের এক পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করতে আদবানি সচেষ্ট ছিলেন। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ভোট টানতে বরাবরই মদত দেন বলে তরুণ গগৈ-এর বিরুদ্ধে আমজনতার ক্ষোভ রয়েছে। সম্প্রতি উলফাদের কাজে লাগাতে গগৈ যে অভিযোগ করেছেন, তা জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে অত্যন্ত লজ্জাজনক বলে গুয়াহাটির বুদ্ধি জীবীরা মত প্রকাশ করেন।

বিষম বস্তু

ভোট বড় বিষম বস্তু। তামিলনাড়ুর ডি এম কে প্রধান করুণানিধি বোধ হয় এক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ৮৫ বছর বয়সেও হুইল চেয়ারকে নির্বাচনী বাহন হিসাবে ব্যবহার করে দিব্যি প্রচার চালাচ্ছেন। একদিকে বিরোধী নেত্রী জয়ললিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অন্যদিকে ডাক্তারী প্রেসক্রিপসনকে পাথেয় করে তিনি মিটিং-মিছিল চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকদের একাংশের ধারণা ছিল তিনি এবার নির্বাচনী প্রচারে নামবেন না। রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেবেন। বিশেষজ্ঞদের ধ্যান-ধারণার উর্দ্ধে উঠেই করুণানিধি প্রমাণ করেছেন নির্বাচনী রাজনীতিতে সব হয়।

বন্ধুত্বের হাত

ইরানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের শত্রুতা মেটাতে চাইছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ইরানীদের মন থেকে মার্কিন ঘৃণা দূর করতে বদ্ধ পরিকর তিনি। এই ইসলামিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেই বেশি উদ্যোগী ওবামা। সম্প্রতি ইরানীদের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তায় তিনি ইরানের সঙ্গে সুসম্পর্কের আভাষ দিয়েছেন। মার্কিন কূটনীতিকবিদরা ওবামার এই প্রয়াসকে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে গঠনমূলক সহযোগিতা বলে মনে করছেন।

ইউ জি সি-র উদ্যোগ

র‍্যাগিং নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের নিন্দাবাদের পর ইউ জি সি নড়ে-চড়ে বসল। র‍্যাগিং-এর দায়ে অভিযুক্ত হলে, সেই ছাত্র-ছাত্রীর অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারও সারা জীবনের জন্য শেষ হয়ে যেতে পারে। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন এমনই ইঙ্গিত দিয়েছে। ইউ জি সি তাদের নিয়ন্ত্রণ-বিধিতে অভিযুক্ত যাতে আর কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে না পারে সেই ব্যবস্থাও করছে। এই সঙ্গে এক থেকে চার সেমিস্টারের জন্য তাকে বহিস্কারও করা হতে পারে। ইউ জি সি-র পক্ষ থেকে এই প্রথম র‍্যাগিং-এর বিরুদ্ধে এমন কঠোর ব্যবস্থার কথা ভাবা হচ্ছে।

রামমন্দির

রামমন্দির নির্মাণে বিজেপি আবারও একবার দৃঢ় সংকল্পের প্রমাণ দিল। ইতিমধ্যেই দলীয় ইস্তাহারে রাম মন্দিরের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। গালফ নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মুক্তার আববাস নাকভিও রামমন্দির নির্মাণে বিজেপি বদ্ধ পরিকর বলে জানালেন। বিজেপি মনে করে রাম মন্দির তৈরির দায়িত্ব রাম জন্মভূমি ট্রাস্টের। বিজেপি একাজে ট্রাস্টকে সবরকম সাহায্য করবে। দলীয় কর্মী ও সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এবিষয়ে দলের কথাও হয়েছে। ঐক্যমত চূড়ান্ত হলেই কাজে এগানো যাবে।

প্রদীপের নীচে ....

বামফ্রন্টের ৩২ বছর শাসন ব্যবস্থায় প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো উন্নয়ণের লাভ অধরাই থেকে গেছে। পঞ্চায়েতভুক্ত অঞ্চলেও উন্নয়ণের চিত্র একই। সম্প্রতি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র স্বীকার করেছেন, রাজ্যের সাড়ে ৯ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতে 'গ্রাম উন্নয়ণ সমিতি'ই গঠন করা হয়নি। মূলত উন্নয়ণ সমিতির আওতাতেই পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির সুবিধা পায় সাধারণ মানুষ। রাজ্যে ৩৭ হাজার ৬৭টি সমিতি গঠনের কথা ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ২৭ হাজার ৫৬০টি গ্রামে উন্নয়ণ সমিতি গঠন সম্ভব হয়েছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এন ডি এ ঃ না বিশৃঙ্খলা ?

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কোন্ ইস্যুটি ভোটারদের কাছে প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা এখনও পরিস্কার নয়। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দুর্বল পদক্ষেপ এবং আর্থিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী কি এন ডি এ জোটকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লইয়া পঞ্চ দশ লোকসভায় পাঠাইতে সাহায্য করিবে? না কি ভোটাররা জাতীয় মনোভাবের পরিচয় না দিয়া ২০০৪-এর নির্বাচনের মতো আঞ্চ লিক দলগুলিকে পুনরায় লোকসভায় পাঠাইয়া এক খন্ডিত রায় দিবে? অথচ এমন নয় যে বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে কোনও জাতীয় ইস্যু নাই। ইউ পি এ সরকারের ভুল আর্থিক নীতির জন্য দেশ আজ আর্থিক অধোগতির মুখে পড়িয়াছে — পরিণামে বাড়িতেছে বে-রোজগারি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য, কৃষিক্ষেত্রে সরকারি উদাসীনতার ফলে কৃষকগণ বাছিয়া লইতেছে আত্মহত্যার পথ। সরকারি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে এবং আঞ্চ লিক দলগুলির মদতে জেহাদি সন্ত্রাসবাদ ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। পরিণামে জাতীয় সংহতি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আজ বিপন্ন। ইহার সহিত রহিয়াছে ইউ পি এ সরকারের হিন্দু বিরোধী নীতি — এমন সব ইস্যুই ভোটারদের আজ তুলিয়া ধরিতে হইবে।

বিজেপি এবার অসম গণ পরিষদ, জনতা দল (ইউ), শিবসেনা, আর এল ডি, আই এন এল ডি এবং আকালি দলকে সঙ্গী করিয়া এক শক্তিশালী জোট গঠন করিয়া জাতীয় মঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছে। আঞ্চ লিক দলগুলির অযৌক্তিক দাবির কাছে বিজেপি মাথা নত করে নাই। ওড়িশার বিজু জনতা দলের বিশ্বাসঘাতকতায় বিজেপি যেন আরও উজ্জীবিত ও সংহত হইয়া এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। জনগণের কাছে পৌঁছাইবার এই সুযোগ তাহারা দৃঢ়তার সহিতই গ্রহণ করিয়াছে। স্বামী লক্ষ্মণানন্দের খুনীকে ধরিতে অপারগ নবীন পট্টনায়ককে তাহার নয়া দোসর সিপিআই, সি পি এম, এন সি পি ও জে এম এম'র মতো হিন্দু বিরোধী তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি সমেত সমুচিত জবাব দিতে বদ্ধ পরিকর হিন্দুত্ববাদী সমস্ত সংগঠন ও মানুষ। ইতিমধ্যেই বিজেডি হইতে স্বাধীনচেতা কয়েকজন নেতা বাহির হইয়া বিজেপিতে যোগ দিয়াছে।

উল্টোদিকে কংগ্রেস দল এবার বিহার, ইউ পি, মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খন্ডে তাহার জোট শরিকদের লইয়া চরম সমস্যায় পড়িয়াছে। সনিয়ার একান্ত অনুগত লালু প্রসাদ যাদব হঠাৎ তাহার চিরকালের শত্রু রামবিলাস পাসওয়ানের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইয়া বিহারের ৪০টি আসনের মধ্যে ৩৭টিই দুই জনে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। মাত্র ৩টি জুটিয়াছে কংগ্রেসের কপালে। উত্তর প্রদেশের মুলায়মও এখন শত্রুতা ভুলিয়া লালু-পাসওয়ানের সঙ্গে জোট গড়িতেছে। বিহারে, ইউ পি-তে কংগ্রেস দলের সংগঠনের যা নড়বড়ে অবস্থা তাহাতে কংগ্রেসের এখন ছুঁচো গেলা ছাড়া আর কী-ই বা করিবার আছে? ইউ পি-তে কংগ্রেসকে মুলায়মের সমাজবাদী দল মাত্র ৬টি আসন দিতেই কার্পণ্য করিতেছে। তাহার মতে, কংগ্রেসের পক্ষে ৬টি আসনে জয়লাভ করাটাই প্রায় অকল্পনীয়। তাই কংগ্রেসকে আসন ছাড়িয়া দিতে তিনি অপারগ। বিহার ও ইউ পি হইতে ৯টি আসনে জয়লাভ করিয়া কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় পুনরায় বসিবার স্বপ্ন কীভাবে দেখিতেছে? ভগবান জানেন! তবে একমাত্র পশ্চি মবঙ্গে ২৮টি আসনে লড়াই করিয়া তৃণমূল কংগ্রেস সেই স্বপ্ন দেখাইয়াছে, যাহারা কেন্দ্রে কংগ্রেসকে সরকার গড়িতে সমর্থন দিবে। তৃণমূল নেত্রী কি জানেন না কংগ্রেস ও সি পি এম এখনই নিজ নিজ দরজা খোলা রাখিয়াছে নির্বাচনের ফল প্রকাশের কথা চিন্তা করিয়া? কংগ্রেস-সি পি এম জোট করিয়া সরকার গড়িলে তৃণমূল তখন কোথায় যাইবে? কান পাতিলে রাস্তা-ঘাটে এখন এই কথাটি প্রায়ই শোনা যায়।

সকল ছোট ছোট আঞ্চ লিক দলগুলির নেতা-নেত্রীদের মনে প্রধানমন্ত্রীর পদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রতকরিয়া সি পি এম একটি তৃতীয় পক্ষ খাড়া করিয়াছে বটে। ছোট ছোট দলগুলির মধ্যে যে দলটি বেশি আসন পাইবে তাহার নেতা বা কেহ নাকি প্রধান মন্ত্রী হইবে। ইহাতেই বাধিয়াছে গোল। কেউ কাহাকেও আসন ছাড়িতে নারাজ। মায়াবতী সোজাসাপ্টা বলিয়া দিয়াছেন যে তিনি কাহারও সহিত আসন রফায় নাই। সি পি এমও কেরলে দেবেগৌড়ার দলকে তাহাদের নিজের জেতা আসনও কাড়িয়া লইয়াছে। শিবুও বিজেডি-কে আসন ছাড়ে নাই। কেরলে সি পি আই, সি পি এমকে হুঙ্কার দিয়াছে যে তাহারা সব আসনেই প্রার্থী দিবে।

এই হইতেছে তৃতীয় পক্ষের কামড়া-কামড়ি। সবাই ভাবিতেছে যে দল বেশি আসন পাইবে তাহারা সেই দিকেই নৌকা ভিড়াইবে। তাহার পর চলিবে দর কষাকষি। মাথা না নোয়াইলে সরকারের পতন। গোষ্ঠীস্বার্থ, মৌলবাদীদের চাপ সহ্য করিয়া হয়তো সরকার চলিবে। কিন্তু তাহাতে জাতীয় সংহতি, জাতীয় স্বার্থ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব চুলোয় যাইবে। ছোট ছোট দলকে লইয়া জাতীয়তা বিরোধী কমিউনিস্ট দলগুলির বাঁশের খুঁটির ঠেকনা দিয়া যে সরকার চলিবে তাহাতে দেশে আসিবে চরম বিশৃঙ্খলা। কংগ্রেসের যাহা অবস্থা তাহাতে ছোট ছোট দলগুলির সাহায্য ছাড়া সরকার গড়া সম্ভব নয়। যে সরকারের পিছনে কমিউনিস্টরা ঠেকনা হিসাবে রহিবে সেই সরকারের পক্ষে কিছু সদর্থক কাজ করা অসম্ভব। একমাত্র বিকল্প হইতেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। হয় এন ডি এ-কে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদান করিতে হইবে অথবা বিশৃঙ্খলাকে আহ্বান করিতে হইবে। তাই ভোটারদের হাতেই দেশের ভবিষ্যৎ।

জোটের রাজনীতি ও পশ্চি মবঙ্গ

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

অনেক টালবাহানা ও দর-কষাকষির পর শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও তৃণমূল-কংগ্রেসের মধ্যে একটা বাম-বিরোধী সমঝোতা হয়েছে। তার ফলে কংগ্রেস ১৪ টি আসনে অনেকটা সহজেই লড়াই করতে পারবে। তাই এই দল তৃণমূল ও তার সঙ্গীদের হাত ছেড়ে দিয়েছে ২৮টা আসন। পশ্চি মবঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট মোট ৪২টা লোকসভা আসনের জন্য সমঝোতা হয়েছে এভাবেই।

অবশ্য তার জন্য দীর্ঘ সময়, অজস্র বৈঠক, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের মধ্যস্থতা ইত্যাদির দরকার হয়েছে। কারণ সি পি আই (এম) দল যেমন এই ধরনের সমঝোতাকে ভেস্তে দিতে চেয়েছে, তেমন সেই চেষ্টা করেছে কিছু কংগ্রেস নেতারাও। কংগ্রেসের মধ্যে একদিকে আছেন কংগ্রেস (এম) - মার্কা প্রণব মুখার্জীর মতো অনেক কেন্দ্রীয় নেতা, আরও রয়েছেন রাজ্যস্তরের মানস ভুঁইয়া, দীপা দাসমুন্সীর মতো অনেক শিকড়হীন অথচ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিও। সেই জন্য কখনও 'সম্মানজনক' সমঝোতা, কখনও তৃণমূলের এন ডি এ শিবিরে না ফেরার প্রতিশ্রুতি আদায়, কখনও দক্ষিণবঙ্গে আরও বেশি আসনের দাবি — ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে অনেক নেতা ঘোঁট পাকিয়েছেন। এমন কী, শেষ দিকেও সুদীপ ব্যানার্জী ও সোমেন মিত্রকে বিধানসভা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে এই সব কংগ্রেসীদের চাপে যাতে সমঝোতার প্রয়াস ধাক্কা খায়।

তবে মনে হয়, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই ধরনের একটা রফা চেয়েছিল, তার ফলে অনেক দিনের টাল-বাহানার পর সমঝোতা হয়েছে এবং জোট বিরোধী কংগ্রেস নেতা-নেত্রীদের সেটা হজমও করতে হয়েছে।

একটা সময় অবশ্য তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ বিরক্ত ও অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন। প্রণব মুখার্জীর সঙ্গে তাঁর বৈঠকের পর ঠিক হয়েছিল, কংগ্রেস ১৪টা আসনে এবং তৃণমূল ও তার সঙ্গীরা ২৮টা আসনে লড়াই করবে। কিন্তু তারপরেও কংগ্রেস 'জয়যোগ্য' বা 'নিরাপদ' আসনের দাবি জানিয়েছে বারবার। সেই দাবির কিছুটা মেনে নিয়ে বিষ্ণুপুর (সংরক্ষিত) আসনের বদলে বাঁকুড়া আসনও কংগ্রেসকে ছাড়া হয়েছিল। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে কংগ্রেস দক্ষিণবঙ্গে একটা নিরাপদ আসন চেয়েছিল।

মনে হয়, এভাবে ঘোঁট পাকিয়ে কিছু কংগ্রেস নেতা চেয়েছিলেন সমগ্র সমঝোতা প্রয়াসটাই ভেস্তে যাক — তাহলে তাঁদের সি পি আই (এম) -এর সঙ্গে গোপন আঁতাতটা অব্যাহত থাকবে।

১০ মার্চ মমতা ব্যানার্জী জানিয়েছিলেন তাঁকে দুটো দিন অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু ১০ দিন কেটে গেছে — এরপরে আর দু একদিনের বেশি অপেক্ষা করা যায় না — হয়ত কংগ্রেসকে বাদই দিতে হবে।

কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিপদ বুঝে আর ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখতে পারেনি। দিল্লীর সবুজ সঙ্কেত পেয়ে এই ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত নেতা কেশব রাও ১৮ মার্চেই এই সমঝোতা চূড়ান্ত করেছেন। তৃণমূলের কাছে কংগ্রেস ক্ষতি স্বীকার করেছে — এই বক্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন — বামপন্থীদের হঠানোর জন্যই এটা করতে হয়েছে — এটা 'জোট' বা 'সমঝোতা' কোনটাই নয়, এটা হল 'বন্ধুত্ব'। তৃণমূলের কাছে নতি স্বীকারের প্রশ্নই উঠবে না বলে তিনি দাবি করেছেন। তাঁর মতে, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে একটা রফা করা হয়েছে — এর মাধ্যমে বাম শক্তিকে একটা বিরাট ধাক্কা দেওয়া যাবে। তাছাড়া তাঁর ধারণা এই পদ্ধতিতে পরবর্তী বিধানসভার নির্বাচনেও ধরাশায়ী করা যাবে সি পি আই (এম) কে।

তবে এই রফার মাধ্যমে কংগ্রেস স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল যে, তৃণমূল কংগ্রেসই এই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। কারণ কংগ্রেসের পক্ষে ১৪টা আসনে লড়াই করার সুযোগ ঘটলেও তৃণমূল জোটের হাতে থাকছে দ্বিগুণ সংখ্যক (২৮টা) আসন। আগের নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেসের হাতে ছিল মাত্র ৬টা আসন (দার্জিলিং, রায়গঞ্জ, মালদা, জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুর)। এবার তাকে লড়াই করতে হবে আরও ৮টা আসনে। তার মধ্যে জলপাইগুড়ি, আরামবাগ, দুর্গাপুর ও বোলপুরে আগের বার তার স্থান ছিল তৃতীয়, পুরুলিয়ায় ছিল দ্বিতীয়। এবার মালদা, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামের তিনটে কেন্দ্রে তাকে নতুন করে লড়াই করতে হবে।

সম্ভবত কংগ্রেস নেতৃত্ব ভেবেছে — আগের চেয়ে যদি আরও কয়েকটা আসনে জয়লাভ করা যায় এই সমঝোতার ফলে, তাহলে দলের অনেকটাই লাভ হবে। এতে তার রাজনৈতিক শক্তি বাড়বে, বাম-বিরোধী একটা ভাবমূর্তিও তৈরি হবে। অথচ প্রয়োজনে সি পি আই (এম)-কেও মদত দেওয়া যাবে — আদান প্রদানের পুরনো সম্পর্কটা একটা নতুন মাত্রা পাবে। আর তৃণমূলের হিসেবটা হল ভোট-কাটাকাটি কমলে তারও আসন বাড়বে — মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে গোটা দলটারই।

অবশ্য এই রাজ্যের মানুষের একটা বিরাট বড় অংশ বাম-বিরোধী একটা জোটের দাবি করে চলেছিল বহুদিন ধরে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের রাষ্ট্রীয় নারকীয়তার বিরুদ্ধে যে সব শ্রদ্ধে য় বুদ্ধি জীবীরা রুখে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরাও 'একের বিরুদ্ধে এক' তত্ত্ব নিয়ে বাম-বিরোধী জোট গঠনের ডাক দিয়েছিলেন। এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, একটা বাম বিরোধী ঝড় উঠেছে পশ্চি মবঙ্গে তাতে সি পি আই (এম)-এর সাজানো দুর্গ উড়ে যেতে পারে। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-সাংসদ ও কর্মসমিতির নির্বাচনে অবিরত বামপন্থীদের পরাজয় ঘটে চলেছে। পঞ্চ ায়েত নির্বাচনেও ঘটেছে তাদের বিপুল বিপর্যয় — এমনকী, বিধানসভার কয়েকটা উপনির্বাচনেও এই সব দলের প্রার্থীরা পর্যুদস্ত হয়েছে। এক কথায় বলা চলে একটা পরিবর্তনের হাওয়া এসেছে। এই পরিস্থিতিকে বাম বিরোধীরা কাজে লাগাতে না পারলে ইতিহাস কিছুতেই তাঁদের ক্ষমা করবে না।

সেদিক থেকে বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে যে, পূর্বোক্ত জোটটার অত্যন্ত দরকার ছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা কিছু প্রশ্ন তুলতে চাই।

প্রথমত, জোটটা হওয়ার কথা ছিল বামবিরোধীদের মধ্যে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে — কংগ্রেস কি সত্যিই বাম বিরোধী শক্তি? কেন্দ্রে এতদিন বাম-কংগ্রেস আঁতাত ছিল বলে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ইতিবাচক কোনও ভূমিকা নেয়নি, প্রদেশে কংগ্রেসের নেতারাও সেই সরকারি বর্বরতার একটু নিন্দাও করেনি। নন্দীগ্রামের গণহত্যা, নারী-ধর্ষণ, গৃহদাহ, লুণ্ঠন ও 'সূর্যোদয়' সৃষ্টি নিয়ে রাজ্য সরকারের ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে বাতিল করা যেত। রাজ্যপালও ১৬৪ (১) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে পারতেন। কিন্তু এক অদ্ভুত নিরাসক্তি নিয়ে কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার রাজ্যের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের জান্তব স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে। তাছাড়া নয়াচরের প্রস্তাবিত 'হাব্' নিয়ে বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদরা তথ্যের ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার বামপন্থীদের খুশী রাখার জন্য সেই ব্যাপারে অনুমোদন করেছে।

কোনও কোনও কংগ্রেস নেতা-নেত্রী দাবি করেছিলেন মমতা ব্যানার্জীকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, তিনি আর এন ডি এ-র দিকে ঝুঁকবেন না। কিন্তু কংগ্রেস কি কথা দিয়েছে যে, এই দল প্রয়োজনে বামেদের সঙ্গে আঁতাত করবে না?

বিশেষ করে প্রণববাবুদের কথা মনে করা যাবে। এই ব্যক্তি রাজ্যসভায় যাওয়ার সময় বাম ভোটও পেয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি বুদ্ধ বাবুর সুরেই প্রশ্ন তুলেছেন — শিল্প কি আকাশে হবে? সি পি আই (এম)-এর হাতে তামাক খেয়ে তিনি সিঙ্গুরে মোটর শিল্পের বিরোধীদের নিন্দা করেছেন অর্থনীতির প্রাথমিক জ্ঞানটা অর্জন না করেই। এমনকী, কলকাতা হাইকোর্টও এই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছিল। প্রণববাবু কিন্তু হেঁড়ে গলায় উল্টো সুর গেয়েছেন। তিনি ও তাঁর অনুগামীদের প্রভু কে বা কারা — এটা এখন সবাই জেনে গেছেন। তাহলে যে জোটটা হল — সেটা কি সত্যিই বাম বিরোধী? এটাই কি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বিরোধী মঞ্চ ?

দ্বিতীয়ত, পি ডি এস প্রকৃত অর্থেই একটা সি পি আই (এম) বিরোধী শক্তি। তাছাড়া এই দলের নেতা ও কর্মীরা বরাবরই রাজ্য সরকারের স্বৈরাচারের বিরোধিতা করেছেন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সরকারি বর্বরতার বিরুদ্ধে তাঁরা আন্তরিকভাবে সংগ্রাম করেছেন, অত্যাচারিত মানুষদের সঙ্গে দিন কাটিয়েছেন। তৃণমূলের সঙ্গে তাঁরাও থেকেছেন প্রথম থেকেই।

তাহলে তাঁদের কোনও আসন ছাড়া হল না কেন? এক্ষেত্রে কেন ঘটল এক অদ্ভুত অনৈক্য? এই ব্যাপারে বাম বিরোধী ভোট কিছুটা হলেও কি ভাগ হয়ে যাবে না? একটা আসন তো পেয়েছে প্রগতিশীল ইন্দিরা কংগ্রেসও।

তৃতীয়ত, বিজেপি ও বাম বিরোধী একটা শক্তি। এটা সত্যি যে, এই সঙ্গে তার তেমন সংগঠন নেই। কিন্তু বাম বিরোধী একটা বৃহত্তর জোট গঠন করা যেত না তাকে নিয়েও?

(এরপর ১৬ পাতায়)

অর্ধেকেরও বেশি আসন খোয়ানোর আশঙ্কায় সি পি এম

(১ পাতার পর)

চোপড়ায়। যে কেন্দ্রগুলিতে বিজেপির জনভিত্তি কংগ্রেসের থেকে বেশ বেশি। সেখানকার সি পি এম প্রার্থী জীবেশ সরকার মূলত ওই চারটি বিধানসভার ওপর ভরসা করেই নির্বাচনে লড়ছেন। এছাড়া গুরুং বিজেপি-র সাথে জোট করলে সেই বিরোধী জোট অলিপুর দুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে সি পি এমকে যথেষ্ট বেগ দেবে বলে পার্টির আশঙ্কা। ঝাড়গ্রামে জনজাতিদের জোটবদ্ধ আন্দোলন যথেষ্ট বিপাকে ফেলেছে সি পি এম নেতৃত্বকে। গতবার সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি ভোটে জেতা রূপচাঁদ মুর্মুকে সরিয়ে সেখানে প্রার্থী করা হয়েছে পুলিনবিহারী বাস্কেকে। মূলত সিপিএম সন্ত্রস্ত এলাকা যেমন গড়বেতা ইত্যাদিতে ভোটের মুখে সন্ত্রাসের মাত্রা বাড়িয়ে জেতার পরিকল্পনা ছকে রেখেছেন বলে খবর। তবে এই জনজাতিদের আন্দোলনের ঢেউ পুনর্বিন্যস্ত বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রটিতে যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। ওই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চারটি বিধানসভা ডিলিমিটেশনের ফলে বাদ গিয়ে পরিবর্তে যুক্ত হয়েছে জনজাতি অধ্যুষিত রায়পুর, রাণীবাঁধ ও তালডাংরা। এগুলি এবার লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া কেন্দ্রটিতে মুখ্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেবে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অনুমান। পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিরীখে দমদম ও ব্যারাকপুরে বিরোধী জোট বেশ খানিকটা পিছিয়ে থাকলেও পুর এলাকা সমৃদ্ধ ওই কেন্দ্র দুটিতে জনসমর্থন কোনদিকে যাবে তা বুঝতে গিয়ে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে সিপিএমের। বিশেষ করে দমদম গত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বেও বিজেপির দখলে ছিল। তবে দমদম লোকসভা কেন্দ্র পুর্নবিন্যাসের পর তা থেকে বিধাননগর বেরিয়ে যাওয়ায় কেন্দ্রটি ধরে রাখার ব্যাপারে যতটা আশাবাদী সিপিএম, তেমনি বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের সঙ্গে বিধাননগর যুক্ত হওয়ায় তা হারানোর আশঙ্কায় ততটাই কন্টকিত তারা।

আসনের নাম	২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনে কে কত ভোটে জয়ী	২০০৬-এ বিধানসভা নির্বাচনের শতকরা ভোটের হার (ডিলিমিটেশনের ভিত্তিতে)		২০০৮-এ পঞ্চায়েত নির্বাচনের শতকরা ভোটের হার (ডিলিমিটেশনের ভিত্তিতে)	
		বামভোট	বিরোধী ভোট	বামভোট	বিরোধী ভোট
তমলুক	লক্ষণ শেঠ সিপিএম ৫৭,৩৮০	৫০.৭২	৪৭.২৮	৪৬.২৯	৫১.৭১
ডায়মন্ডহারবার	শমীক লাহিড়ী, সিপিএম-১,৫৩,৭৮৪	৪৬.৩৬	৫০.৬৪	৪৪.২২	৫২.৭৮
যাদবপুর	সুজন চক্রবর্তী, সিপিএম-৮৯,৬৬৮	—	—	৪৬.১৪	৫১.৮৬
কৃষ্ণনগর	জ্যোতির্ময়ী শিকদার, সিপিএম-২০,৩৮৭	৪৬	৪৮	৪২.৬২	৫০.৩৮
রানাঘাট	অলোকেশ দাস, সিপিএম-১০,০০০	৪৬.৬৩	৪৮.৩৭	৪৪.৪	৫০.৬০
বঁনগা (সংরক্ষিত)	অসীম বালা, সিপিএম	৪৮.৪২	৪৭.৫৮	৪৬.৯৮	৪৯.০২
বসিরহাট	অজয় চক্রবর্তী, সিপিএম-১,৮২,০৮৪	৪৯.০১	৪৭.৩০	৪৭.২	৪৯.৮
মথুরাপুর	বাসুদেব বর্মন, সিপিএম-৮২,০২৮	৪৮.৪৫	৪৮.৫৫	৪৫.০৪	৫১.০৬
রায়গঞ্জ	প্রিয় রঞ্জন দাসমুন্সি, কংগ্রেস-৩৯,১৪৭	৪৩.১	৫২.৯০	৫১.২৮	৪৪.৭২
মালদা উত্তর	(নতুন লোকসভা কেন্দ্র)	৪৫.৮৬	৫০.১৪	৪৬.৫৬	৪৯.৪৪
জঙ্গিপুর	প্রণব মুখার্জী, কংগ্রেস-৩৬,৮০৭	৪৭.৮৪	৪৯.১৬	৪৯.২	৪৭.৮
কাঁথি	প্রশান্ত প্রধান, সিপিএম-৫৯,১৯০	৫০.০২	৪৭.৯৮	৫০.৪৮	৪৭.৫২
বীরভূম	ডাঃ রামচন্দ্র ডোম, সিপিএম-১,৯১,৬১২	৫০.১৮	৪৫.৫২	৪৯.৮২	৪৬.১৮
কলকাতা (উত্তর)	মহম্মদ সেলিম, সিপিএম (উঃ-পূঃ ও উঃ-পঃ একত্রিত নতুন কেন্দ্র)	৪৯.২৯	৫১.৭১	—	—
কলকাতা (দক্ষিণ)	মমতা ব্যানার্জী, তৃণমূল-৯৮,৪৩৮	৪১৪৮	৪৮.৫২	—	—

গত পাঁচ বছরে কর্মহীনতার অপদার্থতা ঢাকতে সিপিএম তো বটেই, বামফ্রন্টের দুই শরিক আর এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লকও তাদের অধিকাংশ প্রার্থীকেই বদল করে রাজ্যবাসীকে ধোঁকা দেবার যে পরিকল্পনা নিয়েছিল এই মুহূর্তে তা ব্যুমেরাং হয়ে গিয়েছে। টিকিট না পেয়ে সেই বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহীরা আদর্শ আর বামপন্থী রাজনীতির মধ্যে ফারাকটা সূর্যালোকের মতো স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

বর্ধমানে সিপিএমের আবু আয়েশ মন্ডল, আলিপুরদুয়ারে আর এস পি-র জোয়াকিম বাক্সলা ও কোচবিহারে ফরওয়ার্ড ব্লকের নৃপেন বর্মন টিকিট না পেয়ে বিদ্রোহী হয়েছেন। কোনও কাজ না করলেও নিজেদের এলাকায় তাদের রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট। মার্কসীয় শিক্ষানুরাগী সুদিন চট্টোপাধ্যায়কে ফরওয়ার্ড ব্লক বারাসতে প্রার্থী করায় পার্টির জেলা সম্পাদক সরল দেব বিদ্রোহীর ভূমিকায়। সাধারণত ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীরাও নিষ্ঠাবান। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শিক্ষাবিদ চন্দন চক্রবর্তীকে প্রার্থী হিসেবে না পাওয়ায় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তারা নিষ্ক্রিয়। আলিপুরদুয়ারে বাক্সলার প্রার্থী হওয়া ও সেখানে বিজেপি-গোর্খা জনমুক্তির সমীকরণ সম্ভব হলে গভীর গাড্ডায় পড়বে সিপিএম। সেই 'ড্যামেজ কন্ট্রোল' এবার আলিমুদ্দিনের ভোট ম্যানেজারদের কাছে 'কঠিনতম নির্বাচন'।

সব মিলিয়ে সি পি এম নেতৃত্বের হিসেবে বিরোধীরা কমপক্ষে ১৭টি, সর্বোচ্চ ২৪টি আসন পেতে পারে এবং বামফ্রন্ট কমপক্ষে ১৮টি ও সর্বোচ্চ ২৫টি আসন পেতে পারে। তবে গতবারের ৩৫ থেকে তাদের আসনের পরিমাণ যে অনেকটাই কমবে এ বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিত তারা। ভোটের ফলাফল যাই হোক না কেন, এই রাজ্যে ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের সব কটিতেই ল্যাজে গোবরে অবস্থা বামফ্রন্টের— এ দৃশ্য কবে দেখেছে রাজ্যবাসী?

এই বা কম কি? রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রে এবার ডি-লিমিটিশনের ফলে পাল্টে গিয়েছে সীমানা।

২০০৬-এ বিধানসভা ভোট ও ২০০৮-এ পঞ্চায়েত নির্বাচন যদি ওই পাল্টে যাওয়া সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকত তবে যা ভোটচিত্র পাওয়া যেত তা উল্লেখিত হয়েছে রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির ভোট সংক্রান্ত তথ্যভান্ডারে। তার মধ্যে বেশ কিছু আসনের পরিসংখ্যান উল্লেখ করছি যে আসনগুলিকে কেন্দ্র করেই এ রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে অর্ধেকরও বেশি আসন হারানোর আশঙ্কায় সিপিএম তথা বামফ্রন্ট শঙ্কিত।

দিল্লী থেকে ক্যানিং-এর দুই নাবালিকা উদ্ধার

সংবাদদাতা ।। গত ছয়মাস ধরে নিখোঁজ মেয়ে পাপিয়ার (১৭) খোঁজে তার বাবা অধীর সিকদার এবং বজরঙ্গ দলের প্রাক্তন কার্যকর্তা দীনবন্ধু ঘরামী সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা গত ৬ মার্চ দিল্লী গিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কার্যালয় যোগাযোগ করেন এবং অপহৃতা মেয়েটির উদ্ধারে সাহায্য চান।

দিল্লী পরিষদের কার্যকর্তারা সেই রাত্রিতেই দিল্লী পুলিশের সহযোগিতায় কয়েকটি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে পাপিয়াকে উদ্ধার করে এবং সেই সঙ্গে সিঙ্গুর থেকে ৯ মাস পূর্বে অপহৃতা অন্য এক কন্যা পিঙ্কি (১৭)-কেও উদ্ধার করে আনে। উদ্ধারের পর সিঙ্গুর থানার মাধ্যমেই পিঙ্কির বাড়িতে সংবাদ জানানো হয়। মেয়ের খোঁজ পেয়ে পিঙ্কির মা, মামা ১০ মার্চ দিল্লী পৌঁছায়।

অকুস্থল থেকে দুই মেয়েকে উদ্ধার করার পর দিল্লীর কমলা মার্কেট থানা থেকে তাদের কোর্টে তোলা হলে সেখানে STAFF নামে এক NGO তাদের কন্যা আশ্রমে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন করে। কিন্তু বিচারপতি তাদের দাবি অগ্রাহ্য করে দিল্লীর তিহার জেলের নারী নিকেতনে১৬ মার্চ পর্য্যন্ত থাকার নির্দ্দেশ দেন।

১৭ মার্চ দিল্লীর তিস হাজারী কোর্টে ওই দুই মেয়েকে তোলা হলে বিচারপতি মেয়েদের বাবা-মার আবেদন স্বীকার করে মেয়েদের তাদের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

দিল্লী পরিষদ কার্যকর্তাদের প্রয়াসে মুক্ত ওই দুই মেয়ে তাদের বাবা, মা-র সঙ্গে ১৮ মার্চ দিল্লী থেকে তাদের নিজ গৃহে রওনা হয়ে যায় এবং ১৯ মার্চ কলকাতা পৌঁছে তাদের অপহরণ কর্তাদের চিহ্নিত করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

স্বস্তিকার দাম
প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

আফিম চাষের রমরমা

(১ পাতার পর)

থেকেই স্পষ্ট চাষের সঙ্গে চোরাকারবারীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। চোরকারাবারীরাই তাদের সুবিধা মতো স্থানে আফিম চাষে মদত দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার অবশ্য কেন্দ্রের এই সতর্কতা নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়। বরং নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে এ রাজ্যের এনফোর্সমেন্ট ব্র্যাঞ্চ । হিসাবমতো এরাই আফিম খেত পুড়িয়ে দিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। সে সব তো রাজ্য সরকার করেইনি, উলটে সরকারি খামারে আফিম চাষের অনুমতি চেয়েছে অর্থদপ্তর। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক অবশ্য পত্রপাঠএই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। বরং বলেছে, অবিলম্বে আফিম খেত পুড়িয়ে চোরাকারবারীদের গ্রেপ্তার কর।

বরুণকে ফাঁসাতে তিল থেকে তাল

(১ পাতার পর)

নাগরিকদের আছে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের প্ররোচনা দিতে পুলিশ লাঠি, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। শূন্যে গুলি চালায়। অভিযোগ যে জনতা পাথর ছুঁড়েছিল। পাথর ছুঁড়লেই গুলি চালাতে হবে এমন নির্দেশ কে দিয়েছিল? কারণ, গুলি চালাবার নির্দেশ দিতে পারে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট। ঘটনাস্থলে কোনও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন প্রেস রিপোর্টে এমন উল্লেখ দেখিনি। তাই বরুণের বিরুদ্ধে জাতীয় সুরক্ষা আইনের প্রয়োগটি নিয়ে যথেষ্ট সংশয় থাকছে। মনে হয়, মুসলিম তোষণে কংগ্রেসকে টেক্কা দিতেই মায়াবতী এই চাল চেলেছেন।

আগের কথায় ফিরে আসি। বরুণ পিলভিটে দলীয় কর্মীসভায় সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত। ভাল কথা, তবে একই অপরাধে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা মহসিনা বিদোয়াই এবং কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ইমরান বিদোয়াইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে না কেন? গত ১৫ মার্চ চন্ডিগড়ে দুই বিদোয়াই মুসলিম মহাসম্মেলন ডেকে ছিলেন। মোট ২৩টি মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে ইমরান স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "যদি আমার হাতে ক্ষমতা থাকতো, তাহলে আমি ফতোয়া দিয়ে মুসলমানদের বিজেপিতে যোগ দেওয়া ইসলাম বিরোধী কাজ বলে ঘোষণা করতাম। কংগ্রেস চিরকাল মুসলিম পারসোন্যাল ল'-কে সম্মান দিয়েছে। বিজেপি দেয়নি....."। তাজ্জব ব্যাপার। এই বক্তৃতার ক্যাসেট নির্বাচন কমিশনের হাতে থাকলেও আজ পর্যন্ত টুঁ শব্দটিও করা হয়নি। অথচ ফতোয়া নামক ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসনের হুমকি দিয়ে ভোটদাতাদের ভয় দেখানো এবং প্রভাবিত করা ভারতীয় জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের পরিপন্থী। শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বরুণকে ভিলেন করতে দেশের সংবাদমাধ্যম এখন আদাজল খেয়ে লেগেছে। দিল্লীর সেই একই সংবাদমাধ্যম মহসিনা ইমরানের সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার বিরুদ্ধে কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটেছে।

হত্যার রাজনীতি চলছেই

(১ পাতার পর)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সিপিএমের নেতা ও থালামারি কেন্দ্রের বিধায়ক কোদিয়ারি বালকৃষ্ণণ-এর দপ্তর থেকে জেলা পুলিশ সুপারিটেনডেন্ট-এর কাছে এই মর্মে নির্দেশ আসছে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, এই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যখন বিরোধী আসনে বসতেন, তখন উত্তেজিত সিপিএম সমর্থকদেরকে প্রয়োজনে থালাসারি থানায় বোমা মারতে উস্কানি দিয়েছিলেন। এদের জন্যই শৃঙ্খলার অবস্থা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে বলে জেলার মানুষেরা আক্ষেপ করে থাকেন। একজন গুন্ডা রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হওয়ায় তারা লজ্জাবোধ করছেন।

পার্টির সেক্রেটারি পিনারাই বিজয়ন এই কান্নুর-এরই লোক। সিপিএমের কান্নুর লবি রাজনৈতিক বিরোধীদের যে একেবারেই সহ্য করতে পারে না তার প্রমাণ হল সাংসদ এ পি আবদুল্লাকুট্টিকে পার্টি থেকে বিতাড়ন। আবদুল্লা বিরুদ্ধে অভিযোগ — তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটের উন্নয়ণ মডেলের প্রশংসা করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

আবদুল্লা কুট্টির বহিস্কারের পরে পরেই একরকম হঠাৎই আর এস এসের কার্যকর্তা ও কর্মীরা সিপিএমের ক্যাডারদের আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু হয়ে উঠে। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার রাজ্য সহ সভাপতি পি সত্যপ্রকাশ-এর বাড়ি তছনছ করে দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ(বি এম এস)-এর কর্মী বিজয়ন-কে সিপিএম ক্যাডাররা প্রকাশ্য দিবালোকেই কুপিয়ে খুন করেছে। অথচ দুস্কৃতীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের কোনও তৎপরতাই লক্ষ্য করা যায়নি।

এইসব হত্যাকান্ডের নাটের গুরু পার্টির কান্নুর ইউনিটের সম্পাদক পি হরিন্দ্রন বলে অভিযোগ। পান্নুর হল কান্নুরের হত্যার রাজনীতির কেন্দ্র।

রাজা রাজনীতি

নিশাকর সোম

সোমনাথ চ্যাটার্জী চান নির্বাচনে পর্যুদস্ত হোক সি পি এম

তৃণমূল নেত্রী তাদের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করলেন — যার ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন। কারণ তাদের ওয়ান পয়েন্ট প্রোগ্রাম হল সিপিএম হঠাও। লোকসভা নির্বাচনে জিতে মহাকরণ দখলের অভিযানে এগোও। ভাল কথা। কিন্তু এর সঙ্গে নেত্রী বলেছেন — (১) বিজেপি-কে কোনও সমর্থন নয়, (২) কেন্দ্রে ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল সরকার গঠনে তৃণমূল সাহায্য করবে এবং (৩) যেহেতু কংগ্রেস সি পি এম-কে ত্যাগ করেছে, তাই তিনিও এনডিএ ত্যাগ করেছেন।

এখন ১ এবং ২ নং-এর কথাগুলির সঙ্গে সিপিএম-ও ঐক্যমত পোষণ করবে। ভবিষ্যতে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল সরকারকে (পড়ুন কংগ্রেস সরকারকে) মদত দেবে তৃণমূলের সাংসদরা। কংগ্রেস নেত্রীর কাছ থেকে যে দায়বদ্ধ তা চেয়েছিল তা সফল হল। ভাবতে অবাক লাগে এন ডি এ-তে থেকে বি জে পি-র বদান্যতায় তিনি রেলমন্ত্রী ছিলেন — এর পূর্বে কোনও প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যের বাড়িতে গিয়ে তাঁর মা'কে শ্রদ্ধা জানাননি — কিন্তু অটলবিহারী বাজপেয়ী তা করেছিলেন। এই তো তার পুরস্কার। এটা তো কৃতঘ্নতার এক চরম প্রকাশ। যে নেত্রী রোজার ইফতারে থাকেন, মতুয়াদের পুজোয় যোগ দেন, রবি দাসদের মিছিলে থাকেন — তিনি ধর্মনিরপেক্ষ না — সর্ব ধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে ভোট বাড়ানোর লক্ষ্য-কে সামনে রেখে এগোন। ধন্য রাজনীতি — নির্বাচন অতি বিষমবস্তু। নীচের তলার তৃণমূল কর্মীরা নাকি আদবানী সম্পর্কে সংবাদপত্রে একথা-সেকথা বলে বেড়াচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। মমতাও পূর্বে একাধিকবার বলেছিলেন — "আদবানী বাবরি মসজিদ ভাঙার হোতা।" তবুও বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মমতাকে সিপিএম বিরোধী আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে সম্মান জানিয়েছিলেন।

অবশ্য নির্বাচনে জেতার জন্য সিপিএম প্রার্থীরাও বহু কান্ড-কীর্তন করছেন, যেমন — বড়বাজারে হনুমান মন্দিরে মহঃ সেলিম সিঁদুরের টিপ নিয়ে মালা পরে, চরণামৃত পান করেছেন। অবশ্য এই সব করেও মহঃ সেলিমের জয় কি সুনিশ্চিত? বিরাট প্রশ্ন। কারণ এই কেন্দ্রের নীচের তলার পার্টি কর্মীরা লোকের কাছে যাচ্ছেন না এবং নেতৃত্বের নির্দেশ মতোন জনগণের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে জবাবও দিচ্ছেন না। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন — "যাঁরা বিরোধী তাঁদের কাছেও যান।" সিপিএম-এর নীচের তলার কর্মীদের মনোভাব হল মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিক — আর যাঁরা বিরোধী তাঁদের বুঝিয়ে পক্ষে আনা যাবে না, শুধু শুধু সময় নষ্ট করে লাভ কি? সিপিএম-এর নীচের তলার কর্মীরা পুরানো নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে যোগ-বিয়োগ করে জয় সম্পর্কে একেবারে সুনিশ্চিত হয়ে বসে ওয়ার্ম-আপ করছেন, দিনের দিন ওয়ান ডে ম্যাচ খেলার জন্য।

সিপিএম-এর পলিটব্যুরো এখন তৃতীয় ফ্রন্টের চিন্তায় বিভোর — এটা হল বুনো হাঁসের পেছনে দৌড়ানো। কারণ এসব দলগুলি হল হাওয়া মোরগ।

এছাড়া সিপিএম-এর বিতাড়িত দলছুটরা দলে দলে সিপিএম-বিরোধী শিবিরে ভিড়ছেন। অলোক নন্দী থেকে অলোক মজুমদার সকলেই সিপিএম-এর নির্বাচনী ছলাকলা বিরোধীদের জানাচ্ছেন। অলোক নন্দী তো জনসভায় বক্তৃতা দেবেন। জ্যোতি বসু সোমনাথ চ্যাটার্জির বিশিষ্ট বন্ধু কলকাতার প্রাক্তন মেয়র কমল বসু উত্তর কলকাতায় চুপচাপ কেন? সুধাংশু শীল-এর সমর্থকগণও কি সক্রিয় আছেন।

সোমনাথ চ্যাটার্জী

সম্প্রতি এক অন্ধ সিপিএম স্তাবক এক দৈনিকে জনৈক অগ্নিস্রাবী প্রাক্তন নকশাল নেতা বসে যাওয়া সিপিএম কর্মীদের সোচ্চার হবার আহ্বান জানিয়েছেন! এদিকে কিন্তু সিপিএম-এর ওল্ড গার্ডদের সম্পর্কে 'নব্য কমরেডগণ' বলে থাকেন — 'বুডডা হঠাও। এই বুডডারা খালি ঘি খেয়েছে তার গন্ধ ছড়াচ্ছে। এদের মাথায় ১৯৬৯ সাল ঢুকে আছে।"

যাদবপুর কেন্দ্রে সৈফুদ্দিন চৌধুরী প্রার্থী হওয়াতে সিপিএম সমর্থকগণ হর্ষে বিগলিত হয়েছিল। তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি সৈফুদ্দিন তথা পিডিএস তৃণমূলের ভোট কাটাবে না — কাটবে সিপিএম-এর ভোট। সমীর পুততুন্ড আর অনুরাধা দেব-এর সঙ্গে সুজন চক্রবর্তী এবং তাঁর শ্বশুর সিপিএম-এর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক শান্তিময় ভট্টাচার্য-এর তীব্র কলহ ছিল। তাঁরা এবার তার শোধ তুলবে। সমীর পুততুন্ড-এর ভাষার শান্তি ভট্টাচার্য-এর নেতৃত্ব খতম হবেই। এ-সব সংবাদ টিএমসি নেত্রীর জানা আছে বলেই তিনি কর্মীদের বলেন, পিডিএস -কে "ইগনোর" কর।

উত্তর কলকাতায় তৃণমূলের মধ্যেও দ্বন্দ্ব আছে — বকসী দম্পত্তি কি করবেন? তৃণমূল কর্মীদের একাংশ সাধন পান্ডে এবং তারক ব্যানার্জি সম্বন্ধে বলে থাকেন যে "সিপিএম ঘনিষ্ঠ"।

শতাব্দী রায়ের কেন্দ্রে কংগ্রেসের বেশিরভাগ কর্মী বসে আছেন। তাঁরা বলছেন — "সিপিএম নয় শতাব্দী নয়।" স্বপন ব্যানার্জি কি বলেন? তিনি তো নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে গেছিলেন। এখন বহিষ্কারের হুমকিতে কিল খেয়ে শতাব্দীর পক্ষে প্রচার করবেন বলে বিবৃতি দিচ্ছেন।

এছাড়া তৃণমূল ছেড়ে যাঁরা কংগ্রেসে চলে গেছেন তাঁদেরকে একেবারেই কাছে আনতে চাইছেন না তৃণমূল নেত্রী। নির্বেদ রায়, মালা রায় কি বলেন? এই নির্বেদ রায়-ই নাকি নেত্রীর কবিতার ইংরাজি তর্জমা করেছিলেন? রাজনীতি হচ্ছে "ম্যারেজ অফ কনভিনিয়েস" নয় কি? এদিকে তৃণমূল দেওয়ালে লিখছে — "টাটা গেল ন্যানো গেল বাংলা হল শুদ্ধ — এবার বুদ্ধ যাবে"...." মেটিয়াবুরুজে এক সভায় তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, সিপিএম বজ্জাতের হাঁড়ি। তৃণমূল নেত্রী বলেছেন — সিঙ্গুরের জমি অন্য শিল্পপতির কাছে বন্ধক দেওয়া হয়েছে।

মুম্বাই-তে ন্যানোর প্রথম প্রকাশের পর এ-রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কেন? এ দুঃখের কারণ তো তিনি এবং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য।

নির্বাচন অতি বিষমবস্তু। তার ফলে মতুয়াদের নিয়ে দড়ি টানাটানি চলছে। নিয়মিতভাবে তৃণমূলের নেতারা যাচ্ছেন।

(এরপর ৬ পাতায়)

অন্য রকম

ছোটো তবুও ছোটো নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বস্তির মধ্যে থেকেও তাদের যে লেখাপড়ার সুযোগটুকু জুটবে তা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। মা-বাবারাও কোনওদিন ভাবেননি। এসবই সম্ভব হয়েছে তাদের দাদাদের জন্য। তাদের সহোদর দাদা না হলেও, তারা কোনও অংশে কম নয়। জসকরণ সিং, চিরাগ কাটাল, কুণাল বিন্দ্রা, নিখিল গুপ্তা, শুভঙ্কর শর্মার মতো দাদাদের জন্যই আজ তাদের স্বপ্ন পূরণ উৎসাহ-উদ্দীপনায় বস্তির কচি-কাচাদের ভাগ্য ফিরেছে। রাহুর দশা থাকলেও বস্তির বাচ্চারা বুধ-বৃহস্পতির দাক্ষিণ্যে শিক্ষিত হচ্ছে।

ভূপালের শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ঘরের টিনএজারদের কাছে এই অ্যাসোসিয়েশনে

বস্তির কচিকাচাদের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা

এতদিন তাদের বয়সীদের দূর থেকে স্কুলে যেতে দেখেছে। স্কুলের জানালায় জানালায় কান পেতে, উঁকি মেরে ঘুরে বেড়িয়েছে। অন্যের মুখ থেকে 'টুয়েঙ্কল টুয়েঙ্কল লিটল স্টার' শুনলে ফ্যা ফ্যা করে তাকিয়ে দেখত। নিজেরা মাঝে মধ্যে তা বলার চেষ্টা করলেও, শক্ত শক্ত ইংরেজি তাদের জিবে আটকে যেত। আজ আর তাদের তা হয় না। তারাও অনর্গল ইংরেজি পড়তে পারে। ছড়া পড়ে পাঁচজনকে শুনিয়ে দিতে পারে।

এতদিন এবাড়ি সেবাড়ি ফায়-ফরমাস খেটে দু'এক টাকা রোজগার করে জীবন কাটাতো। লেখাপড়া শেখার ভাবনা তাদের হচ্ছে। শুধু পেটে ভাত নয়, মগজে যাতে কিছু বিদ্যে থাকে তারও প্রচেষ্টা চালাচ্ছে শুভঙ্কর শর্মারা।

মধ্যপ্রদেশের কুণাল বিন্দ্রারা পাঁচজন মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিল 'চিল্ড্রেন ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন। আজ এই সংগঠনই শত শত বস্তির নীলিমার স্বপ্ন পূরণে কাজে লাগছে। তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে সমাজের কাছে আগামী প্রজন্ম রূপে তুলে ধরছে। এ বড় মহৎ কাজ। চিল্ডেন ফেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সদস্য সংখ্যা আটশ'রও ওপর। টিন এজাররাই সংগঠনের কান্ডারি। তারাই সব। তাদের যোগ দেওয়াটাও একটা প্যাশনে পরিণত হয়েছে। তাদের এই প্যাশনই শত শত বস্তির ছেলে-মেয়েকে লিটল চ্যাম্পস করে তুলছে। আজ থেকে মাত্র দু'বছর আগে শুরু হওয়া এই অ্যাসোসিয়েশন খুব কম সময়ের মধ্যেই সমাজে ভালো প্রভাব ফেলেছে। কম বয়সেও যে কিছু করা যায়, সমাজসেবী হওয়া যায়, কুণাল বিন্দ্রিরা মুখে নয়, তা কাজে করে দেখিয়েছে। বস্তির মা-বাবারাও ছেলেদের এই দাদাদের হাতে তুলে দেয়। তাদের সন্তানও শিক্ষিত হবে, বড় হবে। প্রকৃত শিক্ষিত হবে। লিটল চ্যাম্পস হবে, এই আশা নিয়ে।

বাগান মালিকদের সঙ্গে গগৈ-এর রফাতেই চা-র দাম বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বিধানসভায় অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈকে চেপে ধরেছে রাজ্যের বিরোধী দল অসম গণ পরিষদ। কারণ গগৈ নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে কলকাতায় বসবাসকারী অসমের চা-বাগান মালিকদের থেকে নিজের হাতে টাকা নিয়েছেন। একজন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী টাকার জন্যে কীভাবে একাজ করলেন তা নিয়ে অসমের রাজনীতিতে বিস্তর জলঘোলা হচ্ছে। গত ১৪ মার্চ দিল্লী থেকে ফেরার পথে কলকাতায় যাত্রাবিরতি করে তরুণবাবু টাকা তুলেছেন। এই খবর চাউর হতেই রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জোর গলায় ঘটনার কথা অস্বীকার করেন। কত টাকা তরুণ গগৈ তুলেছেন তা নিয়ে কেউ মুখ খোলেনি। ওদিকে হিমন্তবাবুর বক্তব্য ছিল — চা-বাগানগুলোরই অবস্থা ভালো নয়, তারা আবার টাকা দেবে কোত্থেকে? একথা বলার পরদিনই তরুণ গগৈ নিজেই জানিয়ে দেন — তিনি নির্বাচনী তহবিলের জন্য কলকাতা থেকে টাকা সংগ্রহ করেছেন। ফলে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার অবস্থা। এদিকে বাজারে চায়ের দাম ক্রমশই ঊর্দ্ধমুখী। দেড়'শো টাকার নীচে কোনও চা-ই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এন ডি এ আমলে ১০০-১১০ টাকা কিলো দরে চা পাওয়া যেতো।

ভারতবর্ষে চায়ের যোগান দেয় মূলত অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ। এবার সহজেই অনুমেয় চায়ের দামের ঊর্দ্ধগতির আসল কারণটা কী। কয়েকবছর আগেও

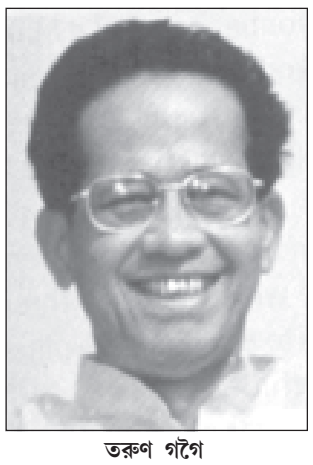

তরুণ গগৈ

সন্ত্রাসবাদীদের তোলা আদায়ের চাপে অসমের চা-শিল্পে নাভিশ্বাস উঠেছিল। এবার রাজ্যের শাসকদলও যদি সেই একই কাজে নেমে পড়ে, তাহলে চাপটা সোজা গিয়ে পড়ছে জনসাধারণের উপরে। নির্বাচনী তহবিলে এভাবে শাসক দলের প্রধান টাকা তুললে বাকী দলগুলো কী করবে। অসমে আসন্ন নির্বাচনে অগপ-বিজেপি আসন রফা হতেই রাজ্য কংগ্রেসের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। সেজন্য তারা মানুষকে খাওয়াতে চাইছে যে, অগপ টাকা নিয়ে সমঝোতা করেছে। অগপ অবশ্য তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রমাণ দিতে বলেছে।

অগপ দলের মুখপাত্র অতুল বোরা বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় চা-বাগান মালিকদের সঙ্গে কি রফা করেছেন তা প্রকাশ করতে হবে। কেননা চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা আদৌ ভালো নয়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পদের অমর্যাদা করেছেন। এটা রাজ্যের মানুষের পক্ষে অপমানকর। গত ১৮ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে তরুণ গগৈর অগপ দলের অভিযোগ খারিজ করে দেন। অগপ অভিযোগ করেছিল সন্দেহভাজন বিদেশী নাগরিক ও কংগ্রেসী সাংসদ মণিকুমার সুববাকে টাকার বিনিময়ে এবারও প্রার্থী করা হচ্ছে। শ্রীগগৈ জানিয়েছেন, সুববার নাগরিকত্ব নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। চলছে সিবিআই তদন্ত। তিনি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত টিকিট দেওয়া হবে না।

ত্রিপুরায় সেবাধামে শিবলিঙ্গের প্রাণপ্রতিষ্ঠা

পীযূষকান্তি ভট্টাচার্য ।। যাঁরা জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে ভাবনাহীন চিত্তে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত রাজ্য ত্রিপুরায় এসেছিলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেই চারজন প্রচারক দীনেন্দ্রনাথ দে, সুধাময় দত্ত, শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত। তাঁদের কাজের অগ্রগতি ও সাফল্যে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল দেশদ্রোহী দুর্বৃত্ত ধর্ম কারবারীর দল। তাই খৃস্টান দুর্বৃত্তরা উগ্রবাদীর ছদ্মবেশে কাপুরুষের মতো তাদের অপহরণ করে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছিল। শহীদ চার প্রচারকের ইপ্সিত কাজকে চরিতার্থ করতে তাদেরই স্মৃতিতে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি (ত্রিপুরা)-র আন্তরিক প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এক বহুমুখী সেবা প্রকল্পের। যার নাম 'সেবাধাম'।

ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী চতুর্দশ দেবতার স্নেহছায়া তলে লালিত একটি গ্রাম যার নাম পূর্ব চম্বামুড়া। ওই গ্রামে গড়ে উঠতে চলেছে এই প্রকল্প, উদ্দেশ্য ত্রিপুরার গ্রাম-পাহাড়ে যেখানে পাওয়া যায় না আধুনিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা, তাদের কাছে সেবার ডালি নিয়ে হাজির হওয়া এবং যাদের মনে সেবা কার্য করার বাসনা থাকলেও সুযোগ ও সামর্থের অভাবে তা মনের কোণে সুপ্ত থেকে যায়;তাদেরকে সেবাব্রতী হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।

অর্থাৎ একদিকে সেবাকার্য ও অন্যদিকে সেবাব্রতী কর্মী নির্মাণ।

হিন্দুরা যে কোনও কাজ করার আগে দেবতার করুণা ও আশীর্বাদ কামনা করে। তাই প্রথম মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ শিবরাত্রির দিন দেবাদিদেব মহাদেবের প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। কাশীর পণ্ডিত আচার্য জীতেন্দ্র যিনি গঙ্গা বাঁচাও মহাসভার সভাপতি, তিনি নিজে পন্ডিত বর্গ ও ফটিক নির্মিত শিববাণ এনে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি ভোর থেকে বিবিধ বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম ও যজ্ঞের মাধ্যমে শুরু হল কার্যক্রম। বহু লোক গ্রাম ও শহর থেকে আসায় ছোট গ্রামটি মেলায় পরিণত হয়। সবাই দেখছে রুদ্রাভিষেক জলাভিষেক কার্যক্রম যা ত্রিপুরায় দুর্লভ। প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল ত্রিপুরেশ্বর শিব ঠাকুরের। হাজার হাজার নর-নারী দুধ দিয়ে ভক্তিভরে স্নান করালেন নব প্রতিষ্ঠিত শিবকে।

২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি দুই দিন ধর্ম সভায় ধর্মালোচনা করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রভাসচন্দ্র ধর, ডঃ সতীনাথ দে, চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠ রক্ষার ত্রিদন্তী ভিক্ষু ভক্তি কমল বৈষ্ণব ও দারিদ্রভঞ্জন দাস প্রমুখ।

২৩ ফেব্রুয়ারি দুপুরে মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়। খয়েরপুর ও কাশীপুর অঞ্চলের সহৃদয় ব্যক্তিদের আর্থিক ও সামগ্রী দানেই এই বিরাট কার্যক্রম সম্ভব হয়েছে। এই এলাকারই বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বিনয় লোধ সস্ত্রীক শ্রদ্ধার সঙ্গে মুখ্য যজমানের কার্য সম্পন্ন করেছেন।

উন্নয়ণের লক্ষ্যেই গুয়াহাটি মঞ্চের ভোট দেওয়ার ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত 'গুয়াহাটি লোকসভা সমষ্টি উন্নয়ণ মঞ্চ' এলাকার ভোটারদের সচেতনভাবে নির্বাচনী অধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানান। মঞ্চের পরামর্শদাতা দয়ানন্দ পাঠকের কথায় প্রার্থীকে শুধু দলীয় প্রতিনিধি নয়, এলাকার আপামর জনতার প্রতিনিধি হতে হবে। আর জনগণকেও ভোটের সময় দলীয় আনুগত্যের উর্দ্ধে উঠে এলাকার উন্নয়ণের দৃষ্টিতে ভোট দিতে হবে। সেই সকল প্রার্থীদেরকে ভোট দিতে হবে যাদের কাজের ফলাফল জনকল্যাণকারী। কাজের বা জনসেবার মূল্যায়ণের ভিত্তিতেই ভোট হবে।

মঞ্চের সভাপতি কৈলাস শর্মার কথায় বিগত তিন বছরে গুয়াহাটির জনপ্রতিনিধির (সাংসদ) কাজ আশানুরূপ নয়। উন্নয়ণ ও জনক্যলাণমূলক কোনও কাজই হয়নি।

এবার গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী রবীন বড়দলৈ-এর জেতার সম্ভাবনা কতটা? — এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশর্মা নিতান্তই নিরাশ হন। তিনি বলেন, এবার ভোটাররা বড়দলৈকে ভোট দিতে অনিচ্ছুক। কেননা গুয়াহাটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেসনের প্রশাসক হিসেবে বড়দলৈ-এর কাজ হতাশাজনক। গুয়াহাটির বাসিন্দারা নানা নাগরিক সমস্যায় জর্জরিত। ট্যাক্স বেড়েছে, অথচ মহানগরের জলনিকাশি ব্যবস্থা খুবই খারাপ। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি তে মানুষ নাজেহাল।

এছাড়া, মঞ্চের উপদেষ্টা দয়ানন্দ পাঠক দাবি করেছেন, কেন্দ্রের বরাদ্দ এলাকা উন্নয়ণ তহবিল খরচের যথাযথ হিসাব সাংসদকে দিতে হবে।

অসমে অগপ-বিজেপি জোট

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অসমে কোমর বেঁধে হই হই করে নির্বাচনে নেমে পড়েছে অগপ-বিজেপি জোট। গত ২০ জানুয়ারি বিজেপি-র পর্যবেক্ষক সুধাংশু মিত্তল দুই দলের নেতাদের একসঙ্গে নিয়ে আলোচনা বৈঠক সেরে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। নির্বাচনী প্রচার চালানোর জন্য এক সমিতিও উভয় দলের নেতাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। ছবিতে (বাঁ দিক থেকে) অগপ সভাপতি তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, ফণীভূষণ চৌধুরী, বিজেপি নেত্রী ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজয়া চক্রবর্তী, সুধাংশু মিত্তল ও ধ্রুবপ্রসাদ বৈশ্য প্রমুখকে দেখা যাচ্ছে।

পর্যুদস্ত হোক সি পি এম

(৫ পাতার পর)

মতুয়াদের প্রধানা বীণাপাণি দেবী তো মতুয়ার ভবিষ্যৎ দায়িত্ব নাকি মমতার হাতে দিতে চান। মমতাও সানন্দে গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন — এটা কি সাম্প্রদায়িকতা নয়? মমতা আবার বাবরি মসজিদ ভাঙার কথা গার্ডেনরিচের-র জনসভায় বলেছেন। বাবরি-র ঘটনার পরেও তো মমতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বিজেপি-র সঙ্গে ছিলেন! তবে কি তিনি টগর বোস্টমী?

এই মতুয়াদের খুশী করার জন্য সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর পরম ধার্মিক সুভাষ চক্রবর্তী মতুয়াদের কাছে গিয়ে বীণাপাণি দেবীর পদস্পর্শ করে অনেক প্রতিশ্রুতির ফানুস (নির্বাচনী আইন ভঙ্গ) দিয়েছেন। সেখানেই কিছু ভক্ত সুভাষবাবুদের তীব্র সমালোচনা করলে, কথা কাটাকাটি হয়। সুভাষবাবু ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেছেন।

সিপিএম-এর পলিটব্যুরো এখন তৃতীয় ফ্রন্টের চিন্তায় বিভোর — এটা হল বুনো হাঁসের পেছনে দৌড়ানো। কারণ এসব দলগুলি হল হাওয়া মোরগ। হাওয়া যেদিকে প্রবল তাঁরাও সেদিকেই ঘুরবেন।

উত্তর কলকাতার সুদীপ ব্যানার্জি-এর জয় প্রায় সুনিশ্চিত বলে বেড়াচ্ছেন তৃণমূলী কর্মীরা। কারণ সিপিএম বিরোধী সব ভোটই নাকি সুদীপ ব্যানার্জিই পাবেন। সুতরাং এই কলামে লেখা হয়েছিল কলকাতার দু'টি কেন্দ্রেই সিপিএম-এর পরাজয় হবে সেটি দেখা যাচ্ছে সঠিক বিশ্লেষণ ছিল। সম্প্রতি কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল — তাঁরা বললেন, "সোমনাথ চ্যাটার্জি নাকি জ্যোতিবাবুকে বলেছেন — তিনি চান সিপিএম লোকসভা নির্বাচনে পর্যুদস্ত হোক — তবেই বুদ্ধ-কারাত কোং-এর শিক্ষা হবে।" ইতিমধ্যে সোমনাথবাবু বীরভূম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অমিত মাল-কে আশীর্বাদ জানিয়ে টেলিফোন করেছেন। ওই সাংবাদিকদের একজন বললেন যে, জ্যোতিবাবু নাকি সোমনাথবাবুকে বলেছেন যে "সব শেষ হয়ে যাবে? এঁরা আমাকে (জ্যোতি বসুকে) গ্রাহ্যই করে না।" তিনি মন্তব্য করেছেন — অর্বাচীনদের হাতে পার্টি নেতৃত্বের ভার পড়েছে, তাই যা হবার তাই হচ্ছে।

রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের হাল— ইউ পি এ ভেঙ্গে খান খান

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভারতের বামপন্থীরা বাস্তবে কোনওদিনই তৃতীয় বিকল্পের আদৌ প্রত্যাশী কি না তা গুরুতর সন্দেহের বিষয়। তারা মনে-প্রাণে প্রথম বিকল্পকেই আঁকড়ে থাকতে চায়। সেজন্য তারা খুবই চিন্তিত। কেননা, বাস্তব পরিস্থিতি হল হিন্দীবলয়ের রাজ্যগুলোতে কংগ্রেসের অবস্থা নিতান্তই বেহাল এবং উপেক্ষণীয়। তথাকথিত ইউ পি এ-এর জোট হিসেবে কোনও অস্তিত্ব আপাতত বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে যে অবশিষ্ট নেই তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলার দৈনিকগুলো এন ডি এ জোট-এর দুই প্রমুখ দল বিজেডি ও চন্দ্রবাবুর তেলেগুদেশম্ বামপন্থীদের সঙ্গে দহরম-মহরম করার কথাটা বেশ ফলাও করে প্রচার করছে। যদিও আসন সংখ্যার বিচারে বিজেডি বা টি ডি পি-র কাছে হাতেগোনা আসনই রয়েছে।

সেই হিসেবে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের লোকসভার মোট আসন সংখ্যা ১২০টি। এরমধ্যে জোটসঙ্গী আর জে ডি এবং মুলায়মের সমাজবাদী পার্টি কংগ্রেসকে মাত্র সাতটি আসন দিতে রাজী হওয়ায়, জোট একপ্রকার ভেঙে গিয়েছে বলাই ভালো। দক্ষিণে ডি এম কে সঙ্গে থাকলেও শ্রীলঙ্কার তামিল সমস্যার কারণে তাদের অবস্থা তামিলনাড়ুতেই ভালো নয়। মওকা বুঝে একদা এন ডি এ-এর জোট সঙ্গী জয়ললিতা বামেদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। ইউপিএ থেকে পাঁচ এম পি-র দল পি এম কে ইউপিএ জোট ছেড়ে দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে মায়াবতীর মায়াজাল মোকাবিলা করতে মুলায়ম সিং যাদবের কংগ্রেসকে প্রয়োজন বলে ধরে নিয়েছিল তারা। যতই নির্বাচন কাছাকাছি আসছে, দেখা যাচ্ছে সমাজবাদী পার্টি কংগ্রেসকে সেই গুরুত্ব দিতে রাজী নয়। রাজ্যে ৮০টি আসনের মধ্যে মাত্র চারটি আসনই তারা কংগ্রেসকে ছাড়তে রাজী। কংগ্রেস দলের মধ্যেই এ নিয়ে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এখনও অবধি উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস ৩৯টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। সমাজবাদী পার্টির বক্তব্য, উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের ভোট মাত্র দু'শতাংশ। এখানে উল্লেখ্য, কংগ্রেস গতবার রাজ্যে নয়টি আসন জিতেছিল। এবার সর্বত্রই উত্তরপ্রদেশে চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছেই। মায়াবতীর বহুজন সমাজবাদী পার্টি (বি এস পি), বিজেপি, সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেস। বামেদের ধর্তব্যের মধ্যেই রাখছেন না। নির্বাচনী বিশেষজ্ঞরা একদা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারকে বাঁচালেও মুলায়ম তাদের জেতা আসন কংগ্রেসকে ছাড়তেও রাজী নন।

বিহারেও কংগ্রেস-এর হাল এতটাই খারাপ যে রামবিলাস পাসোয়ানের লোক জনশক্তি পার্টির সমান সম্মানও দিতে চান না রাষ্ট্রীয় জনতা দলের প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। লালুজী রামবিলাসকে বারোটা আসন ছাড়লেও সোনিয়া কংগ্রেসকে তিনটির বেশি আসনই দিতে চাননি। ইউপিএ সরকারকে সমর্থনের বদলে শাঁসালো রেল দপ্তর কব্জা করলেও আসন ছাড়ার ব্যাপারে লালুপ্রসাদ বড়ই কৃপণ। ফলে বিহারেও ইউ পি এ জোট-এর অস্তিত্বই রইল না। কংগ্রেস এদিকে বিহারে ৩৭টি আসনেই প্রার্থীর নাম জানিয়ে দিয়েছে। বিগত নির্বাচনে কংগ্রেস বিহারে তিনটি আসনে জিতেছিল। গতবারে জোট ছিল। এবার জোটের বাইরে গিয়ে কংগ্রেস ওই তিনটি আসনও জিতবে কিনা সন্দেহ। ঝাড়খন্ডে আর জে ডি এখন কংগ্রেস-

ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার জোটের বাইরে। তবে আর জে ডি এখানে চারটি আসনে আলাদাভাবে লড়াই করবে।

দক্ষিণে ডি এম কে-র উপর ভরসা ছিল কংগ্রেসের। তামিলনাড়ুতে কংগ্রেস গতবার দশটি আসন জিতেছিল। জোটের অন্যতম দল পি এম কে জোট ছেড়ে দিয়েছে। এখন রাজ্যে করুণানিধির নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন ডি এম কে তাদের আগের বারের ১৬টি আসন দখলে রাখতে পারবে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। জোট ভাঙার বিষয়ে কংগ্রেসের দলীয় মুখপাত্র কিছু বলতে চাননি।

মহারাষ্ট্রে শারদ পাওয়ারের দলের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট ছিল আগের লোকসভা নির্বাচনে। ১৩টি আসনে জয়লাভ করেছিল কংগ্রেস। মহারাষ্ট্রে হালেই মুখ্যমন্ত্রী বদল নিয়ে সম্প্রতি অনেক নাটক দেখা গেছে। কংগ্রেসের ভিতরকার গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সেখানে সামনে এসেছিল বারবার। সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষে এবার জোট হলেও জেতা আসন ধরে রাখা বেশ কঠিন। শারদ পাওয়ার যে দু'নৌকায় পা দিয়ে চলছেন তাও সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি এড়ায়নি।

এদিকে মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, গুজরাট, কর্ণাটক মিলে মোট আসন ১৩৮টি। তার মধ্যে কংগ্রেসের দখলে ৪৫টি এবং ভারতীয় জনতা পার্টির দখলে রয়েছে ৮৩টি। বিজেপি দিল্লী বিধানসভার নির্বাচনে আগের থেকে আসন সংখ্যা বাড়িয়েছে। সেই হিসেব ধরলে দিল্লীর সাতটি লোকসভা আসন কংগ্রেসের চার এবং বিজেপির তিনটি হওয়া উচিৎ। আগেরবার ছটি আসনই কংগ্রেস জিতেছিল।

এই হিসাব-কিতাব থেকে কংগ্রেস দলের গতবারের আসন সংখ্যা ধরে রাখাটাই বড় সমস্যা। ফাস্ট ফ্রন্টের এই অবস্থায় সব থেকে উল্লসিত তথাকথিত থার্ড ফ্রন্টের উদ্‌গাতা সিপিএম তথা বামফ্রন্ট। কেরলে তাদের দলের নড়বড়ে অবস্থাটা প্রকট।

শুধু পশ্চিমবঙ্গে বামবিরোধী হাওয়াতে কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস জোট আগেরবারের থেকে দ্বিগুণের (৭ছিল) বেশি আসন জিতবেই — এটা প্রায় সব সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে। তবে সর্বভারতীয় পর্যালোচনায় এন ডি এ-র আবার ক্ষমতার কেন্দ্রে আসার সমূহ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

বিহার-ছত্তিশগড়-ঝাড়খণ্ডে মাওবাদীদের ভোট বয়কটের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত মাওবাদীরা নির্বাচন বয়কটের ডাক না দিলেও তাদের প্রভাবিত বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড়ে রীতিমতো হুমকি

দিয়ে জনগণকে ভোট না দেওয়ার ডাক দিয়েছে। ভারতবর্ষের পঞ্চ দশ লোকসভার নির্বাচন সারা দেশজুড়ে এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ওইসব রাজ্যে মাওবাদীরা নিষিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে শাসক বামফ্রন্ট মাওবাদীদের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জী বার বার রাজ্য সরকারকে মাওবাদীদের নিষিদ্ধ করার ডাক দিলেও, সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার সে কথা কানে তোলেনি।

মাওবাদীদের বিহার ঝাড়খণ্ড-ছত্তিশগড়ের বিশেষ এলাকা কমিটি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে — গত পাঁচ বছরের কুশাসনের পর ভারতে আবার নির্বাচন হতে চলেছে। লোকসভা নির্বাচন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে আবারও পাঁচ বছর কুশাসনের অধিকার দেবে। আরও পাঁচ বছর শাসন মানেই দেশের সাধারণ মানুষের অনাহার ও শোষণকে মেনে নেওয়া। সরকারি নিয়ম-নীতির কারণে বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি।"

এছাড়া ঝাড়খণ্ডে ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে দেওয়াল লিখনও হয়েছে। ঝাড়খণ্ড রাজ্য পুলিশ লাতেহর এবং পালামৌ জেলাতে এরকম দেওয়াল লিখনের কথা স্বীকার করেছে। সেখানে একথাও লেখা হয়েছে যে, ভোট বয়কট না করলে ভয়ঙ্কর পরিণামের মুখোমুখি হতে হবে।'

লাতেহর জেলার এক গ্রামবাসী গণেশ মাঝির বক্তব্য, ভোট এলেই আমরা ভয়ে ভয়ে থাকি। আমরা তো ভয়ের পরিবেশে বসবাস করি। মাওবাদী সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে নিযুক্ত এক পুলিশকর্মীর বক্তব্য, মাওবাদীরা গ্রামীণ এলাকার মানুষদের উপর এভাবেই চাপ সৃষ্টি করে। এরকম ভয় দেখানো সত্ত্বেও ২০০৪-এর নির্বাচনে গ্রামীণ ক্ষেত্রে ভোটের হার শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ ছিল। বিহারে আবার মাওবাদীরা স্রেফ চমকানি দিয়েই সাধারণ ঠিকাদার ও দালালদেরকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত করতে পারে। মাওবাদীরা তাদের ক্যাডারদের জনসাধারণকে ভোট বয়কটে সামিল করার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাওবাদীদের 'গোপাল' নামে জনৈক মুখপাত্র বলেছেন, সরকার ব্যাপক সংখ্যায় আধাসামরিক বাহিনী নিয়োগ করবে। তবে সেক্ষেত্রে তাদের যোগ্য জবাব দেওয়া হবে।

বিহারে শালা-ভগ্নীপতির লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বিহারে এবার লড়াই জমে গেছে। লোকসভার ভোটে লালু আর রামবিলাস মিলে কংগ্রেসকে কোণঠাসা করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তবে এবার লালুকে তাঁরই হাতে গড়া পারিবারিক রাজনীতির হামলা সামলাতে হবে। লালুর দীর্ঘ রাজত্বে তার পরিবারের যারা ক্ষমতার প্রসাদ লাভ করে বাহুবলী বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তাদেরই অন্যতম লালুর শ্যালক সাধু যাদব। সাধু যাদব লালুর কাছে তার প্রাপ্য হিস্যা দাবি করেছেন। লালু শালার দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে শালাকে নিয়ে যথেষ্ট ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছেন। ফলে রাগে ফুঁসছেন শ্যালক সাধু। সাধুও লালুকে টাইট দিতে বিক্ষুব্ধ এবং টিকিট না পাওয়া আর জে ডি এবং লোক জনশক্তির লোকেদের নির্বাচনের ময়দানে নামাতে চলেছেন। খবর হল, কম সে কম এরকম পনেরো জন প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছেন সাধু। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল — রামাইরাম। এছাড়া সাধুর সঙ্গে কথাবার্তা সেরেছেন বিহার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অনিল শর্মা। অনিল শর্মা গত ২০ মার্চ সাধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সাধু জানিয়েছেন, 'অনিল শর্মা বিহারের

সাধু যাদব

সবকটি লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাধুকে অনুরোধ করেছেন। তাঁর আর জে ডি-লোক জনশক্তি জোট বিজেপি-জে ডি (ইউ) জোট-এর মতোই সমান বিরোধী পক্ষ।' এখন সাধু বিহারে কংগ্রেসের কাণ্ডারীর ভূমিকায়। তবে সাধু কংগ্রেসের সঙ্গে কি শর্তে কথাবার্তা হয়েছে তা বলতে অস্বীকার করেছেন। তিনি এখন আর লালুজীকে বিহারের একচ্ছত্র নেতা মানতে নারাজ। লালুর আচরণে সাধু এতটাই ক্ষুব্ধ যে, তিনি সোজা বলে দিয়েছেন লালু আর বিহারে আদৌ জননেতা নন।

সন্ত্রাসবাদী চক্র ধবংস করতে হবে— আর এস এস

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক গত ২০ থেকে ২২ মার্চ নাগপুরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি সভায় গৃহীত তিনটি প্রস্তাব এখানে সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হল—

— সঃ স্বঃ

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা গত ২৬ নভেম্বর ২০০৮ মুম্বাইতে কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসবাদী হামলায় সেনা বিভাগ এবং পুলিশের আধিকারিকসহ অন্যান্য ব্যক্তিগণের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। প্রতিনিধি সভা সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলায় যে সমস্ত অফিসার এবং জওয়ান সাহস ও শৌর্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। এঁদের প্রশংসনীয় তৎপরতার কারণে সন্ত্রাসবাদীদের একজনকে জীবিত ধরা সম্ভব হয় এবং অন্যান্যরা নিহত হয়।

ভারত কয়েক দশক ধরে সন্ত্রাসবাদের শিকার। মুম্বাই কান্ডে আবার প্রমাণিত হল পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের আর্ন্তজাতিক কেন্দ্র। দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির তদন্তে সংগৃহীত তথ্যাবলী মুম্বাইকান্ডে পাকিস্তানের বিভিন্ন সংস্থার যোগসাজসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। পাকিস্তানের সংস্থাগুলি সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় ও প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা এবং আক্রমণের কলা-কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা দেয়।

প্রতিনিধি সভার সুস্পষ্ট অভিমত — বর্তমানে পাকিস্তান দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট দলের উপর জেহাদী হামলা এবং সোয়াত উপত্যকায় রাজনৈতিক ডামাডোল থেকে বোঝা যায় পাকিস্তান ক্রমশ তালিবানদের কব্জায় চলে যাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে আই এস আই এবং সেনাবাহিনীর একটি অংশের প্রচ্ছন্ন মদতআছে। পেশোয়ার, করাচি ইত্যাদি শহর এলাকাতেও তালিবানদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা দেশের পশ্চিম সীমান্তে পুঞ্জীভূত বিপদের মোকাবিলায় উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সরকারকে অনুরোধ করছে। মুম্বাই কান্ডের মতো আকস্মিক ঘটনার মোকাবিলার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকার প্রয়োজন খুব বেশি অনুভূত হচ্ছে। এই ঘটনায় নৌবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ, উপকূল রক্ষী বাহিনী, গুপ্তচর বিভাগ এবং সন্ত্রাস মোকাবিলাকারী সংস্থাগুলির ঘাটতির দিক নজরে এসেছে।

প্রতিনিধি সভা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে মুম্বাই ঘটনার পর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ রোধে শক্তিশালী ও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। বেশ কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে চলছে বিবৃতির ফুলঝুড়ি। মুম্বাই কান্ডের জেরে উদ্ভূত জন অসন্তোষ চাপা দেবার জন্য তাড়াহুড়ো করে আইন প্রণীত হল। কিন্তু বস্তুত কোনও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ ওই আইনে করা হল না। ফলে প্রয়োজনীয় নির্দেশের অভাবে এন আই এ (National Investigating Agency) কাজ করতে পারছে না। উপরন্তু কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্বজ্ঞান বর্জিত মন্তব্যে মুম্বাই কান্ডে পাকিস্তানের যোগসাজসকে উড়িয়ে দিয়ে স্থানীয় কিছু ঘটনাকে কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রতিনিধি সভা আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের কাছে সন্ত্রাস মোকাবিলার জন্য সহায়তা ভিক্ষার ক্রমবর্ধমান সরকারি প্রবণতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ভর্ৎসনা করছে। সন্ত্রাসবাদ রোধে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও একথা স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার যে দেশের সমস্যার সমাধান সরকারকেই করতে হবে। অন্য কেউ এসে আমাদের সমস্যার সমাধান করবে না।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা মুম্বাই কান্ডে যে বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে দেখছে, সেটা হল দেশের অভ্যন্তরে সক্রিয় জেহাদী তথা আতঙ্কবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে সীমান্তের অন্য পাড়ের জেহাদী সংগঠনগুলির নিবিড় যোগাযোগ। এই ধরনের গুরুতর বিষয়ে সরকারের স্বেচ্ছা প্রণোদিত মৌনতা দেখে মনে হয় — সরকার ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। উপরি বর্ণিত পরিস্থিতিতে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সরকারের নিম্নলিখিত দাবিগুলি পেশ করছে।

✦ নিরাপত্তা বাহিনীকে সন্ত্রাস মোকাবিলায় এমনভাবে প্রশিক্ষিত ও সজ্জিত করতে হবে যাতে আগামী দিনে সন্ত্রাসবাদী হামলার সম্ভাবনা লোপ পায়।

✦ পোটা ছত্নথবট্টগ্ন, মকোকার ছত্ত্রথট্রট্টগ্ন অনুরূপ কঠোর আইন প্রণয়ণ-এর সাথে সাথে গুজরাট, রাজস্থানসহ বিভিন্ন রাজ্যের প্রণীত আইনগুলিকেও অনুমোদন দিতে হবে।

✦ দেশের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এবং তাদের এজেন্সীগুলিকে (নির্দেশ পাওয়া মাত্র সক্রিয় হয়ে কাজ শুরু করার মতো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে) চিহ্নিত করে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নিশ্চি হ্ন করতে হবে।

✦ দেশের তদন্তকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সংগৃহীত তথ্যাবলীর নিবিড় ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের মোকাবিলায় একটি সংযুক্ত কমান্ড গঠন করা।

✦ সংবাদ মাধ্যম, সাধারণ মানুষ এবং বিভিন্ন সংগঠনকে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের মোকাবিলায় প্রশিক্ষিত করা।

✦ কোনওভাবেই রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নেওয়া ব্যবস্থায় ঢিলেমী দেওয়া চলবে না।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা দেশের সাধারণ মানুষ এবং সংবাদ মাধ্যমকে সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সাহস ও দৃঢ়তা প্রদর্শনের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং এই সঙ্গে অনুরোধ করছে যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনগণ যেন সরকারের উপর নিরন্তর চাপ সৃষ্টি করেন।

মত-পন্থের ভিত্তিতে ভেদাভেদ দেশের অখণ্ডতার পক্ষে বিনাশকারী

স্বাধীনতার ৬২ বছর পরেও ইংরেজদের দেখানো মুসলিম তোষণ নীতিকে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করে। এই তুষ্টিকরণের নীতির কারণেই আমাদের মাতৃভূমির বিভাজন হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ন্যায়বিচার ও সমতার আদর্শের ভিত্তিতে একাত্মতা যুক্ত সমাজজীবন রচনা করা হয়নি। পরিবর্তে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধিই দেশ পরিচালনার নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

প্রতিনিধিরে একাংশ।

রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং নিরাপত্তাকে দুর্লক্ষ্য করা হয়েছে। সমাজকে বার বার ভাগ করা হয়েছে। কেন্দ্র সরকার সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু ধুয়ো তুলে দেশে খৃস্টান ও মুসলমানদের প্রতি মুক্তকচ্ছ হয়ে উদারতা প্রদর্শন ও অনুগ্রহ বৃষ্টি করছে। এই বিভেদাত্মক নীতি সমাজকে শক্তিশালী করার বদলে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভাজনের বিভীষিকা উৎপন্ন করেছে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় যে, বিভিন্ন ঋণের বিষয়ে মূল রাষ্ট্রীয় সমাজকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অসম প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। যেখানে তথাকথিত সংখ্যালঘুদের মাত্র তিন শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে মূল সমাজকে শিক্ষার জন্য প্রাপ্ত ঋণে ১২-১৪ শতাংশ এবং ব্যবসার জন্য ঋণ নিলে ১৫-১৮ শতাংশ সুদ দিতে হচ্ছে। এতে ভেদাভেদই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এটা খুবই দুর্ভাগ্যের যে, শিক্ষাক্ষেত্র এবং ছাত্ররাও এই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের রাজনীতি থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। বিবাদাস্পদ সাচার কমিটির সুপারিশকে জাতীয় শৈক্ষিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ-এর মাধ্যমে অষ্টম শ্রেণীর পাঠক্রমে সংযুক্ত করে নিষ্পাপ ছাত্রদের মাথায় ভেদাভেদের বিষে বিষিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্কুল শিক্ষা পর্ষদও এই ভেদাভেদকারী নীতির শিকার হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্কুল শিক্ষা পর্ষদের প্রতীক সূর্য ও পদ্মফুল। এখন এই প্রতীককে ক্রশ এবং তারা যুক্ত অর্দ্ধ চন্দ্রে পরিবর্তন করাটা বিকৃত মানসিকতারই পরিচায়ক। রাজস্থানে অভিভাবকদের আবেদন ক্রমে শুধুমাত্র সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিকের নীচে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা, যেখানে প্রথাগত কোনও শিক্ষা দেওয়াই হয় না, তাকেও কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সমমানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে — যা সব সময়েই নিন্দনীয়। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে ভূপাল, পুনা, কিশানগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ এবং মালাপ্পুরমে আঞ্চ লিক কেন্দ্র খোলার জন্য ২০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। যে সকল রাজ্যে ওই কেন্দ্র খোলা হবে সেই রাজ্যগুলোকে ৫০০ একর জমি নিঃশুল্ক দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রিজার্ভেশন বা সংরক্ষণ দেওয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার প্রয়াস চূড়ান্ত নিন্দনীয়। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের জন্য চার শতাংশ আসন সংরক্ষিত করছে। এছাড়াও সমাজকল্যাণ বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুসূচিত জাতিভুক্ত ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ১২ শতাংশ ধর্মান্তরিতদের (খৃস্টান বা ইসলাম) জন্য বরাদ্দ করে অনুসূচিত শ্রেণীকে (হিন্দু) বঞ্চি ত করেছে রাজ্য সরকার। একইভাবে তামিলনাড়ু রাজ্য সরকার অন্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে বের করে ৭ শতাংশ আসন সংখ্যালঘুদের জন্য বরাদ্দ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রত্যেক বিভাগের বাজেটে ৩০ শতাংশ মুসলমানদের জন্য বরাদ্দ এবং পতিত সরকারি জমি মুসলমানদের মধ্যে বন্টনের প্রস্তাব পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবস্থাকেই নির্দেশ করছে।

দেশজুড়ে সংখ্যালঘুবাদ-এর যেন প্রতিযোগিতা চলছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বিহার সরকার। বিহারের পূর্ণিয়া, আরারিয়া, কাটিহার ও কিশানগঞ্জ — এই চার জেলাতে দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মুসলমান ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ফি-তে পুরো ছাড় দেওয়া হয়েছে। অথচ ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলার সাধারণ ছাত্রদের ক্ষেত্রে এরকম শুল্ক-ছাড়ের জন্য বারবার আবেদন জানানোর পরও কোনও কিছু করা হয়নি। এছাড়া বিহারে দশম শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ সকল মুসলমান ছাত্রদের জন্য ১০ হাজার টাকার পারিতোষিক মুসলিম তুষ্টীকরণ নীতির জাজ্বল্যমান উদাহরণ। ওদিকে কেরল সরকারের মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য পেনশন দেওয়ার সিদ্ধান্তও এরকম আরও একটি উদাহরণ বলা যেতে পারে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সুস্পষ্টভাবে বলতে চায় যে, আমাদের সমাজের কোনও একটি বর্গকে সম্প্রদায় হিসেবে সুযোগ-সুবিধা বা প্রাধান্য দেওয়া আমাদের সংবিধানের নীতিবিরুদ্ধ কাজ। এই সময়ে মুসলমান ও খৃস্টান সমাজের সমঝদার লোকেদেরও এই সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণের বিরোধিতায় সামনে এগিয়ে আসা উচিৎ।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার দাবি, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে দেওয়া সবরকম সংরক্ষণ, ছুট তথা বিশেষাধিকার অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। একই সঙ্গে প্রতিনিধি সভা সকল দেশবাসীকে এই বিপদ সম্পর্কে সমাজকে অবাহিত করা এবং নীতি-নির্ধারকদের উপর চাপ সৃষ্টি করে বিভেদমূলক নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

সম্রাট শ্রী কৃষ্ণদেব রায়ের রাজ্যাভিষেকের ৫০০ বছর পূর্তি

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা

(এরপর ৯ পাতায়)

নখদন্তহীন সি বি আই

উপেন বিশ্বাস

একটি তদন্তকারী সংস্থার যদি সামান্যই স্বাধীনতা থাকে শক্তিমান, উচ্চ পদস্থদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার এবং এই সংস্থার যদি কোনও নিজস্ব আইনই না থাকে, তাহলে এই সংস্থার কাছ থেকে তার দায়িত্ব পালনের উজ্জ্বল উদাহরণ আশা কদাচিৎ করা যেতে পারে।

কয়েকটি রাজনৈতিক ভাবে সংবেদনশীল মামলায় সি বি আইয়ের সাম্প্রতিক ন্যক্কারজনক ভূমিকা গভীরভাবে প্রোথিত এই ব্যাধির দিকেই আঙ্গুলি নির্দেশ করছে যা সংস্থার কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। সি বি আইয়ের রাজনীতিকরণ দুই দিকেই কাটছে। প্রথমতঃ, এতে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা মানুষদের বিরুদ্ধে আনা মামলার নিরপেক্ষ তদন্ত বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত এর ফলে সৎ অফিসাররা মনোবল হারাচ্ছে যাতে সংস্থার সামগ্রিক কর্মকুশলতাই মার খাচ্ছে।

আজ সি বি আই এই উভয় দিকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিছু কিছু মামলায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে এক পা-ও এগোতে পাচ্ছে না, আর অন্যদিকে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে নৈতিকতা এতটাই তলানিতে ঠেকেছে যে, সাধারণ মামলারও যুক্তিসংগত সমাপ্তি ঘটতে দিচ্ছে না। আমি প্রায়ই অফিসারদের বলতে শুনতাম — কি হবে নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোর কাজ করে, যেখানে রাজনৈতিক দাক্ষিণ্য থাকলেই উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে অনায়াসেই উপরে ওঠা যায়। এটা ভয়ানক অবস্থা।

‘‘আমাদের এমন এক সরকারের দরকার যে সরকার জনজীবনে ন্যায্য বিচারের ভাবনাকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারবে। কেবলমাত্র তাহলেই আমরা সি বি আইকে একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখার আশা করতে পারি।’’

এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে সি বি আইয়ের আজও নিজস্ব কোনও আইন নেই এবং এর কাজ চলছে দিল্লী স্পেশাল পুলিশ এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্টের নির্দেশে। অতীতে সব সরকারের কাছেই সি বি আইয়ের জন্য একটি পৃথক আইন প্রণয়নের নানান প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। কিন্তু কোনও সরকারই তাতে গুরুত্ব দেয়নি।

কোনও না কোনও আকারে বা ইঙ্গিতে ‘একক নির্দেশের’ প্রতিবন্ধকতা বড় বড় রুই-কাতলাকে ধরার পথে একটা প্রধান বাধা। অনুরূপভাবে, আদালতে সি বি আইয়ের বিপক্ষে দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার স্বাধীনতা না থাকায় সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কিছু করা যায় না। আর এর ফলে সি বি আই গঠনের মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যাহত হচ্ছে।

আজ সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলোর প্রায় সমস্ত বড় বড় মামলাগুলোর তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে তদারকি করার কারণই হচ্ছে সি বি আইয়ের সক্ষমতা সম্পর্কে আস্থার অভাব। ভারতের প্রথম শ্রেণীর একটি তদন্তকারী সংস্থা সম্পর্কে এই ধরনের আচরণ, সংস্থাটির সুনামের পক্ষে আর কতটা হানিকর হতে পারে। সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল একটি অন্যতম দুর্নীতি মামলার তদন্তের প্রধান হিসেবে আমার হাতেনাতে অভিজ্ঞতা হয়েছে কীভাবে বাহ্যিক হস্তক্ষেপ তদন্তকে প্রভাবিত করে। ১৯৯৬ সালে পশুখাদ্য নিয়ে ১০০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারির যে ঘটনা খবরের কাগজের শিরোনামে এসেছিল, সেই ঘটনার তদন্তকে বানচাল করতে জড়িতদের পক্ষ থেকে কী উন্মত্ত প্রচেষ্টাই না করা হয়েছিল। বস্তুত, তৎকালীন বিহার সরকার জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছিল যাতে কেসটা সি বি আইয়ের কাছে না যায়। কিন্তু বি জে পি ও জনতা দল (ইউ) নেতাদের করা জনস্বার্থ মামলার ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট সি বি আইকেই এই কেলেঙ্কারির তদন্ত করার ভার দেয়। তারপর থেকে ১২ বছর কেটে গেছে কিন্তু এখনও এই পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির মূল ষড়যন্ত্রকারীরা এবং এই থেকে সুবিধাভোগীরা অধরাই রয়ে গেছে। প্রাণী সম্পদ দপ্তরের আমলারা এবং অফিসাররা সাজা পেয়েছে, কিন্তু এই কেলেঙ্কারির মূল কারিগররা নানান কারসাজি করে বিচারের ধারাকে বিলম্বিত করেছে।

এই পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির তদন্ত করতে গিয়ে আমি দেখেছি অত্যন্ত কাছ থেকে কিভাবে রাজনীতিকরা তাদের বশংবদ অফিসারদের সাহায্যে দড়ি টানাটানি করে। আমাকে কিভাবে চাপ সহ্য করতে হয়েছিল লালুপ্রসাদ যাদবকে এ কেসের তদন্তের বাইরে রাখার জন্য। আমার নিজের উর্ধ্বতন অফিসাররা আমাকে বলেছিল যাতে লালুর নাম চার্জশিট থেকে বাদ দিই। আমি আজ অবশ্যই বিচার ব্যবস্থা ও গণ মাধ্যমগুলির একাংশকে ধন্যবাদ জানাই ষড়যন্ত্রকারীদের এই কালো হাতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করার জন্য।

বাস্তবিক সত্য হল এই যে এমন কী কিছু বড় মাপের রাজনৈতিক নেতারাও আমাকে সরাসরি বলেছিল এবং প্রভাবিত করতে চেয়েছিল জাত-পাত ও ধর্মের নামে। আমি এদের এই উন্মত্ত ব্যবহারে মর্মাহত হয়েছিলাম কিন্তু অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করতে চাইনি বলেই ব্যাপারটি চেপে গিয়েছিলাম। একটা সময়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই রাজনীতিকরা এমনভাবে সি বি আই-কে কুক্ষিগত করে ফেলেছিল যে এর প্রতিটি ফাইলের গতিবিধি এবং প্রতিটি হানার খবর এরা জেনে ফেলছিল।

আমার মনে হয় সময় এসেছে সি বি আইয়ের জন্য স্পেশাল পুলিশ টিম গঠন করার যাতে তারা নিজেরাই সার্চ অপারেশন চালাতে পারে। এখন তো এই হানা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারি কর্তাদের দ্বারস্থ হতে হয়। তাতে স্বাভাবিকভাবেই খবর ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন সি বি আইয়ের কাজে অগ্রগতি আনতে ব্যর্থ হয়েছে। সি ভি সি-কে আরও কার্যকরী হতে হবে এবং রাজনৈতিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সি বি আইয়ের চরিত্রও সম্পূর্ণভাবে বদলে ফেলতে হবে।

প্রথমেই প্রয়োজন ভেবে দেখার আই পি এস অফিসারদের ডেপুটেশনে সি বি আইয়ে নিয়ে আসা এবং পুনরায় রাজ্য সরকারি কাজে ফিরিয়ে দেওয়ার বর্তমান নিয়মের পরিবর্তন করার কথা। আমাদের প্রয়োজন সেইসব নিজ কর্মে উৎসর্গীকৃত অফিসারদের যাদের অনুসন্ধিৎসু মন আছে এবং যারা সি বি আই-এ নিজেদের কেরিয়ার গড়তে ইচ্ছুক। সি ভি সি’-র হাত-কেও শক্তিশালী করা দরকার যাতে সি বি আইয়ের উপর কড়া নজরদারি করতে পারে।

আমাদের এমন এক সরকারের দরকার যে সরকার জনজীবনে ন্যায্য বিচারের ভাবনাকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারবে। কেবলমাত্র তাহলেই আমরা সি বি আইকে একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখার আশা করতে পারি। ততদিন অবশ্য আমরা আশা করি বিচারব্যবস্থা ও গণমাধ্যমগুলি সজাগ দৃষ্টি রাখবে যাতে তদন্তের ধারাকে কেউ ব্যাহত করতে না পারে।

লেখক সি বি আই-এর প্রাক্তন জয়েন্ট ডাইরেক্টর।

সৌজন্য : লেখাটি ‘দি পাইওনিয়ার’ পত্রিকার ৪ ফেব্রুয়ারি ’০৯ সংখ্যায় থেকে প্রাপ্ত এবং এন সি দে কর্তৃক অনূদিত।

অখণ্ডতার পক্ষে বিনাশকারী

(৮ পাতার পর)

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিশ্ববিখ্যাত সম্রাট শ্রী কৃষ্ণদেব রায়ের ১৫১০ খৃস্টাব্দে সম্পন্ন হওয়া রাজ্যাভিষেককে ভারতীয় ইতিহাসের এক নির্ণায়ক মূহুর্ত বলে মনে করে।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ১৩৩৬ খৃস্টাব্দে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার লক্ষ্যে করা হয়েছিল। সেসময় মুসলিম আক্রমণকারীদের বর্বর হামলার কারণে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিল। স্বামী বিদ্যারণ্যের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং হরিহর ও বুক্ক রায়ের শৌর্য-বীর্যের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

স্থায়ী শান্তি, আর্থিক সমৃদ্ধি, বিকশিত কলা-সাহিত্য ও উন্নত স্থাপত্য, আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য ও কূটনীতি এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আনন্দপ্রদ সামাজিক জীবনের কারণে বিজয়নগর সাম্রাজ্য বিশ্বের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। দেশি ও বিদেশী ঐতিহাসিকরা একে ভারতের ইতিহাসের এক স্বর্ণিম অধ্যায় ও অবিস্মরণীয় সাম্রাজ্য বলেছেন।

শালিবাহন শক সম্বতের ১৪৩১ এর মাঘী শুক্লা চতুর্দশীতে (২৪ জানুয়ারি, ১৫১০ খৃস্টাব্দে) শ্রী কৃষ্ণদেব রায়ের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি এক বীর যোদ্ধা, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ, কলাকার ও বিদ্বান হওয়ার পাশাপাশি প্রজাবৎসল শাসকও ছিলেন। তিনি বিচার ব্যবস্থা ও কৃষির সংস্কার করেন। তাঁর শাসনকালে জল সংরক্ষণের পদ্ধতিকে সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মনে করা হত। তাঁর শাসনকালে সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভারতে হয়েছিল এবং গৌরবের উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। “হিন্দুরায় সুরত্রাণ” উপাধিতে বিভূষিত শ্রী কৃষ্ণদেব রায় যদি এক আদর্শ হিন্দু সম্রাটের প্রতীক হন, তাহলে বিজয়নগর সাম্রাজ্য ছিল এক আদর্শ হিন্দু রাজ্যের উদাহরণ। ভবিষ্যতে হিন্দু সংহতিকে দৃঢ় করার সকল প্রচেষ্টার জন্য এটা প্রেরণার স্থায়ী উৎস হয়ে থাকবে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা মনে করে যে সম্রাট শ্রী কৃষ্ণদেব রায়ের রাজ্যাভিষেকের ৫০০ বছর পূর্ত্তি সমারোহের আয়োজন থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক স্বর্ণিম অধ্যায়ের স্মৃতি পুনরায় জাগ্রত হবে এবং এর মাধ্যমে আমাদের দেশবাসী বিশেষত যুবকদের মনে আত্মগৌরব ও বিশ্বাসের ভাবনা বাড়বে। তাই এই সভা সমস্ত দেশবাসীদের আহ্বান করছে যে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের গৌরবের উপর গুরুত্ব দেবার জন্য তাঁরা যেন বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করেন।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করছে যে —

(১) বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থল হাম্পি (কর্ণাটকে)-কে যেন তাড়াতাড়ি সমস্ত রকমের অবৈধ জবর দখল থেকে মুক্ত করা হয়।

(২) এই ঐতিহাসিক পবিত্র স্থানের স্মারকগুলিকে যেন সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত করা হয়।

(৩) প্রথম থেকেই বিশ্বের ঐতিহাসিক স্থানরূপে ঘোষিত এই স্থানকে এরকম বিকশিত করা হোক যাতে এর প্রেরণাদায়ী স্মৃতিগুলি পুনরায় জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের সামনে ইতিহাসের এই স্বর্ণিম অধ্যায়ের সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয়।

(৪) এই অবসরে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের স্মৃতিতে একটা ডাকটিকিট প্রকাশ করা হোক।

বস্তির কুকুর

মুম্বাইয়ের বিখ্যাত ধারাভি বস্তির একটি হতদরিদ্র ছেলের নানাবিধ বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে কোটিপতি হওয়ার ঘটনাকে নিয়ে নির্মিত 'স্লামডগ মিলিওনেয়ার' ছায়াছবিটি এবছর সেরা ছবির অস্কারসহ আরও সাতটি বিভাগে অস্কার পুরস্কার লাভ করেছে। ইতিপূর্বে এতগুলো অস্কার আসেনি একই বছরে। এমনকী, কোনও ভারতীয় পরিচালকের ভারতীয় ছবি একটা অস্কারও নিয়ে আসেনি। যদিও ভারতীয় ছবি নির্মাতা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সুরকার, গীতিকার, কণ্ঠ শিল্পী ও কলাকুশলীদের মধ্যে প্রতিভা, যোগ্যতা, দক্ষতা ইত্যাদির অভাব নেই। 'স্লামডগ মিলিওনেয়ার' ছবিটির পরিচালক যদি ড্যানি বয়েল না হয়ে কোনও ভারতীয় হতেন, তাহলে তার ভাগ্যে কোনও অস্কার আদৌ জুটত কিনা সন্দেহ।

দীর্ঘদিন ধরে আমরা লক্ষ্য করছি, তৃতীয় বিশ্ব বা ভারতীয় সমাজের অভাব, দুঃখ-দারিদ্র্য নিয়ে পাশ্চাত্য দুনিয়ার পরিচালকদের নির্মিত ছবি কোনও না কোনও আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতে নিচ্ছে। এমনকী, অস্কারও পেয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় নির্মিত 'বর্ণ ইনটু ব্রথেলস্' (বেশ্যালয়ে জন্ম) তাদের মধ্যে একটি, 'সিটি অব জয়'ও হাতে টানা রিক্সাওয়ালার জীবন ও বস্তিবাসীদের দারিদ্র্যের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে নির্মিত। 'স্লামডগ মিলিওনেয়ার'ও বস্তি জীবন ও দারিদ্র্যকে নিয়ে তৈরি ছবি। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতের অভাব-দারিদ্র্য নিয়ে নির্মিত ছবি (ফায়ার, ওয়াটার, সিটি অব জয় ইত্যাদি)-র বিরুদ্ধে এদেশে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শিত হলেও, 'স্লামডগ মিলিওনেয়ার'-এর বিরুদ্ধে তেমন কিছু ঘটেনি — প্রতিবাদেও কেউ সোচ্চার হয়নি। যদিও 'স্লামডগ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ — বস্তির কুকুর। বস্তিতে যেমন মানুষ বাস করে তেমনি কুকুরও বাস করে। তাই বলে বস্তির মানুষদের 'কুকুর' আখ্যা দেওয়া! প্রতিবাদ তো ছবির নামের বিরুদ্ধেই ওঠা উচিত ছিল। আসলে পশ্চিমীদের দৃষ্টিতে ভারত হচ্ছে 'ল্যান্ড অব বেগারস্' (ভিক্ষুকের দেশ)। তাই বস্তিবাসী মানুষ ও কুকুর তাদের কাছে সমার্থক। ভারতের দারিদ্র্য-দীর্ণ ও অভাবক্লিষ্ট বস্তি তাদের চোখে নরক বৈ কিছু নয়। ভারতবাসীর কাছে এর চেয়ে নির্মম লজ্জা ও অপমান আর কী হতে পারে?

তাই প্রশ্ন, 'স্লামডগ মিলিওনেয়ার'-এর আটটি অস্কার জয় এবং ভারতীয়ের অস্কার প্রাপ্তি কি প্রতিবাদীদের মুখে দিয়েছে কুলুপ এঁটে? তাঁরা কী হারিয়ে ফেলেছেন প্রতিবাদের ভাষা? ছবিটি কী জাতীয় লজ্জা নয়?

ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া

ভারত

পুরাকালে সপ্তদ্বীপা পৃথ্বীর একটি দ্বীপ, তার নাম ছিল জম্বুদ্বীপ। কালক্রমে জম্বুদ্বীপে মহাপরাক্রান্ত মহারাজ ভরতের নামানুসারে এই দ্বীপটির নাম হল ভারত।

"উত্তরঙ্গ যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রশ্চৈ ব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।।

"সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে ভারতবর্ষ নামক স্থানে, যেখানকার সন্তানেরা ভারতীয় নামে খ্যাত।"

পশ্চিম এশিয়ার আরবীয় দেশ সমুদ্রের সাথে মুসলিম পূর্ব যুগে (Pre Islamic era) ভারতের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, আদান-প্রদান, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় চলত। আরবীয় পণ্ডিতেরা যেমন ভারতে আসতেন, ভারতীয় পণ্ডিতেরাও তেমন আরবে যেতেন। আর ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অহরহ যাতায়াত চলতে থাকত। ভারতের সিন্ধু নদের অববাহিকায় তখন ভারতের উন্নত সভ্যতা ও নগর গ্রাম সৃষ্টি হয়েছিল। সিন্ধু সভ্যতা বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত ছিল। আর সিন্ধু সভ্যতা নামকরণ হয়েছিল সিন্ধু নদের নামানুসারে। আরবীয়রা 'ঝ' কে উচ্চারণে 'হ' বলতেন, সে কারণ "সিন্ধু" কে "হিন্দু" বলতেন। পরিণতিতে "হিন্দু নদ" হিন্দু সভ্যতা এবং তাঁদের কাছে ভারতের নাম হয়ে যায় হিন্দুদের বাসস্থান — "হিন্দুস্থান"। মুসলমান আমলে (Islamic Era) সেই উচ্চারণের ধারা রয়ে গেছে। এখনও আরবীয় মুসলমানদের কাছে ভারতবর্ষ "হিন্দুস্থান" ও সেখানকার অধিবাসীদের "হিন্দু" বা "হিন্দুস্তানী" বলে অভিহিত করে।

গ্রীকরা, আরবের মাধ্যমে হিন্দুস্থানের অধিবাসী হিন্দুদের বিষয়ে পরিচিত হয় এবং পরবর্তীকালে পরস্পর যাতায়াতও আরম্ভ হয়েছিল। আরবীয়রা যেমন "স" কে "হ" বলেন আবার গ্রীকরা "হ" কে-'ই' এর মত উচ্চারণ করেন, তাদের কাছে "হিন্দু" হয়ে গেল INDU "ইন্ডু" আর তা ক্রমে INDU – INDUS – INDIA সমস্ত ইউরোপে INDIA নাম হয়ে গেল। "জম্বুদ্বীপ" নাম আমরা আগেই ত্যাগ করে "ভারত" নাম গ্রহণ করাতে, জম্বুদ্বীপ নাম বিলোপ হয়ে গেছে। ঘটনাচক্রে অপভ্রংশ হতে হতে "ভারতবর্ষের বর্তমান তিনটি নাম (১) ভারত, (২) হিন্দুস্থান (৩) ইন্ডিয়া।

ভারতীয়, হিন্দুস্থানী বা হিন্দু, ইন্ডিয়ান বলে বিশ্বের কাছে ভারতীয়রা পরিচিত। ভারতে আমরা যারা বসবাস করি বা ভারতে জন্মেছি সবাই আমরা "ভারতীয়" তথা "হিন্দুস্থানী" বা "হিন্দু", এতে লজ্জার কিছু নেই। যেমন লজ্জার নেই নিজেকে ভারতীয় বলতে। যেমন আমরা ইউরোপের দেশে গেলে INDIAN বলে নিজেদের পরিচয় দিই আবার পশ্চিম এশিয়ার আরবীয় দেশ সমুহের কাছে আমরা পরিচয় দিই "হিন্দুস্থানী" বলে।

বর্তমানে ভারত আকারে ছোট হয়ে গেলেও, তার আয়তন প্রায় ৩৩ লক্ষ কিঃ মিঃ আর জনসংখ্যা — ১১০ (একশত দশ) কোটি।

সবাই আমরা ভারতীয়, আমরা সবাই "হিন্দু"। "হিন্দু" বলা অপরাধ নয়, দোষের নয়, বরং গর্বের। জাতীয়তার পরিচায়ক।

সুকুমার দে, বসিরহাট, উঃ ২৪ পরগণা।

রাজ্য সরকারের শিক্ষাব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন কর্মহীন হয়ে পড়ে তখন তাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাকে নিয়ে একটু ছিনিমিনি খেলতে ইচ্ছা করে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। প্রথমে কবিগুরুর উপর একটু রাগ হল, তাই সহজপাঠ তুলে দিল। বেশ কিছুদিন পর আবার ঘটা করে পঁচিশে বৈশাখে কবিগুরুকে স্মরণ করার ভন্ডামি শুরু করল এবং সহজপাঠ আবার চালু করে দিল। এরপর সবথেকে বড় সর্বনাশ যা করল তা হল প্রাথমিকে ইংরাজী তুলে দেওয়া। ওই সময় বিরাট সংখ্যক একটা প্রজন্ম ইংরাজী সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে গেল। ফলশ্রুতি যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালির কোনও স্থান হল না। সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বাঙালি সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য হতে লাগল। এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের টনক যখন নড়ল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। যে ভুলের কোনও ক্ষমা নেই। তখন এই লেট-লতিফ সরকার নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে প্রাথমিকে আবার ইংরাজী চালু করল। এই সরকারের আমলে ইতিহাসে প্রচুর ভুল। এরা সংখ্যালঘুকে তোষণ করার জন্য ঔরঙ্গজেবকে প্রজারঞ্জক সম্রাট, আর সম্রাট অশোককে অত্যাচারী বলে ইতিহাসে মুদ্রণ করতেও লজ্জা পায়নি।

এরপর হল মিড-ডে মিল প্রথা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে থেকে টিফিনে খাবার পায় সেই জন্য দুপুরে ভাত, খিচুড়ির ব্যবস্থা করা হল। তাতে কিছু লোক চাকরি পেল। কিন্তু উন্নাসিক ব্যক্তিগণ জাত-পাতের ধুয়া তুলে নিম্নবর্গের রাঁধুনির রান্না তাদের ছেলে-মেয়েদের খেতে নিষেধ করে দিল। ওরা না খাওয়াতে যে উদ্বৃত্ত চাল/ডাল আর যাবতীয় রন্ধনের উপকরণ বাড়ত তা মাস্টারমশাইরা বাজারে বিক্রি করে দিয়ে নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নিত। যে উদ্দেশ্য এই দ্বিপ্রাহরিক খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, যাতে করে বেশি ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়মুখী হয়। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। শিক্ষকদের অনুমানিক অত্যাচার, প্রহার ও পীড়নের ভয়ে তারা বিদ্যলয়ের ছায়া মাড়াতো না। তাতে করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পোয়া বারো।

এতো গেলো বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক থাকার বর্তমান অবস্থার কথা। বামফ্রন্টের আনুকূল্যে বিদ্যালয় নেই, ছাত্র নেই, অথচ শিক্ষক আছে এবং তারা যথারীতি মাসে মাসে মাহিনা নিয়ে চলেছে। কী সুন্দর ব্যবস্থা। এই শিক্ষকরাই কৃতজ্ঞতাবশত নির্বাচনের সময় যাবতীয় কারচুপি করে সরকারকে অক্সিজেন যুগিয়ে চলেছে।

এরপর আছে শিক্ষিকাদের পোশাক সমস্যা। তারা কি পোশাক পরে বিদ্যালয়ে আসবে — শাড়ি না সালোয়ার কামিজ? বামফ্রন্টের পূর্বে এইরূপ শিক্ষায়, শিক্ষা ব্যবস্থায় ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নৈরাজ্য কখনও ঘটেনি। শিক্ষিকাগণ কীভাবে পোশাক পরে নিজেদের প্রকাশ করবে বেশির ভাগ স্কুলে ওই নিয়ে প্রত্যহই প্রতিযোগিতা চলছে। এই নিয়ে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে, আইন-আদালতেও এসে হাজির হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা যাই হোক বা যাই করুক না কেন, অকৃতকার্যের তালিকা শূন্য। কোনও ডিভিসন নেই। ক খ গ ঘ এতেই নাকি সব বোঝা যাবে। ঠিক সেই প্রকার গত বছর সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকেও গ্রেডেশন প্রথার বিলোপ ঘটিয়ে এ বি সি ইত্যাদি চালু করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, "তোমার ছেলে কোনও ডিভিসনে পাশ করেছে গো"। আমার ছেলে এ পেয়েছে। অর্থাৎ ফার্স্ট ডিভিসন সেকেন্ড ডিভিসন উঠে গেল। প্রাথমিকে ক খ গ ঘ-এর মতো মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকে এ বি সি। অর্থাৎ কীভাবে যে শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থাকে একেবারে তলানিতে নিয়ে যাওয়া যায় তারই হীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এবার শিক্ষাকে নিয়ে মারণ-যজ্ঞের খেলা খেলতে নেমেছে। এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩ বছরে ডাক্তার তৈরি করে দেবে। অর্থাৎ পাঁচ বছরের পরিবর্তে তিন বছরে একজনকে পূর্ণ ডাক্তার করে দেবে, আর তাদের গ্রামে-গঞ্জের হাসপাতালে পাঠাবে। তাহলেই বুঝুন এই সরকারের দূরদৃষ্টি। বর্তমানে চিকিৎসা ব্যবস্থার হালও অতি নিম্নমানের। প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখা যায় চিকিৎসা বিভ্রাটের কথা। কারও ডান পায়ে ক্ষত থাকলে বাঁ পায়ে অপারেশন হচ্ছে। কোনও শিশুর বাঁহাতে বাঁশের চোঁচ ফুটলে ডান হাতে অপারেশন করা হচ্ছে, রোগীকে রিলিজ করার পূর্বেই অক্সিজেনের নল খুলে নেওয়াতে রোগী মারা যাচ্ছে। বার্থ সার্টিফিকেটের বদলে ভুলক্রমে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। এরকম ঘটনা অহরহ ঘটছে। চিকিৎসায় বর্তমানে ডাক্তারদের অবহেলা, চিকিৎসা বিভ্রাটের ফলে প্রায়ই রোগী মারা যাবার ঘটনা ঘটছে — পাঁচ বছরের কোর্সে ডাক্তারী পাশ করা ডাক্তারদের হাতে। এরপর রাজ্য সরকার যদি তিন বছরের কোর্স চালু করেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা চিকিৎসা বিভ্রাটের ফলে যে কমতে শুরু করবে তা বলাই বাহুল্য।

দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারি, বর্ধমান

বিজেপি সি পি এমের দোসর হতে যাবে কেন?

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের জোটের বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী দেওয়ায় কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। আমার মতে, বিজেপি সিপিএম-এর দোসর হতে যাবে কেন? বিজেপি প্রথম থেকেই সিপিএম-কে অপসারিত করতে সর্বদলীয় জোট করার কথা বলে এসেছে এবং সেই জোটে যোগ দিতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মমতা ব্যানার্জী মুসলিম ভোটের লোভে বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক দল বলে পরিত্যাগ করে কয়েকটি ছোট দল নিয়ে জোট গঠন করার কথা ঘোষণা করলেন। তার মধ্যে মুসলিম লীগের নামও দেখলাম। বহরমপুরে মমতার জনসভায় মুসলিম লীগের পতাকা এবং লম্বা লম্বা দাড়িওয়ালা ২২ বোতামের ইসলামি জোববা পরিহিত বহু লোককে টিভির পর্দায় দেখা গেছে। দেশ ভাগের প্রাক্কালে যে মুসলিম লীগের লোভের আগুনে ২০ লক্ষ ভারতীয় নিহত হয়েছে, অসংখ্য মাতা-ভগিনী ধর্ষিতা হয়েছে, সেই লীগ মমতার কাছে ধর্মনিরপেক্ষ আর বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল।

মমতা ২৪ দিন অনশন করে প্রচারের পাদপ্রদীপের নীচে এসেছে। সাম্প্রদায়িক দলের সভাপতি রাজনাথ সিং নন্দীগ্রাম যাওয়ার পথে বাধাগ্রস্ত হয়ে অনশন মঞ্চে এসে মমতার সঙ্গে দেখা করেন এবং দিল্লী ফিরে গিয়ে মমতার সমর্থনে সংসদ অচল করে সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে মণিপুরের সমাজ আন্দোলনের কর্মী আইকম শর্মিলা সেখানে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা প্রত্যাহারের দাবিতে গত ৮ বৎসর (২-১১-২০০০) টানা অনশন করেও প্রচারের বিন্দুমাত্র গুরুত্ব পাননি। তাকে আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে ইম্ফলের জওহরলাল সরকারি হাসপাতালের একটি ঘরকে জেলে পরিণত করে নাকে জল দিয়ে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। বুদ্ধ বাবু যদি মমতাকে অনশন মঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পিজি হাসপাতালে বন্দী করে রেখে দিতেন, তবে মমতার দলের কোনও ক্ষমতাই ছিল না, দেশব্যাপী বড় ধরনের কোনও আন্দোলন সংগঠিত করে মমতাকে জেল থেকে রিলিজ করানোর।

মমতার জ্ঞাতি ভাই কংগ্রেস তখন দূর থেকে বগল বাজাতো।

রিজওয়ান-প্রিয়াঙ্কা কান্ডে মমতার তৎপরতা সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য। মুসলিম ভোট পাওয়ার লোভে তিনি প্রায়ই রিজওয়ানের বাড়ি গিয়ে তার মা কিশোর

জনমত

জাহানের চোখের জল নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুছে দিচ্ছেন। কাজটা খুবই প্রশংসনীয়। এখানে সম্প্রতিকালের দুটো ঘটনার উল্লেখ করেছি — (১) শৈলেন্দ্র প্রসাদ (৩২) নামে জনৈক হিন্দু মুর্শিদাবাদের লক্ষণপুর গ্রামের মনোয়া খাতুনকে (২৫) রেজেষ্ট্রারি করে বিয়ে করেছিলেন। এর মধ্যে তাদের একটি পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করে। শৈলেন্দ্র মুন্না সেখ নাম ধারণ করে কয়েক বার তার শশুর বাড়িতে থেকেও গেছেন। তার আচরণে সন্দেহ হওয়ায় তার শ্বশুর বিচার সভা বসিয়ে ১০ জন মুসলমান তার যৌনাঙ্গ পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হয় যে শৈলেন্দ্রের ছুন্নৎ (যৌনাঙ্গের ত্বকচ্ছেদ) হয়নি। ধর্ম লুকিয়ে মুসলমানের মেয়েকে বিয়ে করার অপরাধে গ্রামের মুসলমানরা তাকে প্রচন্ড মারধোর করে নিকটবর্তী পাটক্ষেতে নিয়ে গিয়ে হাত পা বেঁধে জবাই করে দেয়। তারিখটা ছিল ১৪-৭-০৮।

বারাসাতের অর্ক বন্দোপাধ্যায় ভালোবেসে বিয়ে করেছিল বাদুড়িয়ার স্কুল শিক্ষকের কন্যা রেহেনা সুলতানাকে। সেই অপরাধে রেহেনার ভাই মনিরুল ইসলাম অর্কের মাথায় এক জ্যেরিকেন কেরোসিন তেল ঢেলে তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই দুটো ঘটনা নিয়ে মমতা দিদি এবং তার দোসররা এদের সম্বন্ধে একদম চুপ। কারণ এরা দু'জনেই হিন্দু। আর হত্যাকারীরা মুসলমান। সারা ভারতে ৩ লক্ষ ইমাম ভারত সরকারের কাছ থেকে মাইনে পাচ্ছেন। মমতা দিদি ইমামদের মাইনে বৃদ্ধির জন্য বাজপেয়ীর কাছে তদবির করেছেন। অথচ বাঁকুড়ায় পুরোহিত মানিক গাঙ্গুলির তিন কন্যা বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। তার মধ্যে একজন মৃত। মমতা দিদি এদের জন্য কোনও কথাই বললেন না। মৌলবাদী মুসলিমরা যখন তসলিমাকে বিতাড়নের জন্য তাণ্ডব চালালো, তার বিরুদ্ধে মমতা দিদি একটিও কথা বলেননি। তসলিমা দেশ ছাড়ার পূর্বে একটা অত্যন্ত জরুরি কথা বলে গেছেন। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার মাপকাঠি হল মৌলবাদী মুসলিমদেরকে যে যত বেশি তোষণ করতে পারবে, তিনিই তত বড় সেক্যুলারিস্ট।

অতএব এহেন সেক্যুলার মমতা দিদির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিজেপি ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কি করে সি পি এম-এর দোসর হল তা বোঝা যাচ্ছে না।

রামরাজ্য ও রামায়ণের রাজধর্ম

নন্দলাল ভট্টাচার্য

রাম তখন অযোধ্যাপতি। সিংহাসনে বসে আছেন তিনি অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য। কিন্তু বৃথা প্রতীক্ষা! একজনও আসে না অভিযোগ জানাতে।

মনে মনে রাম হয়তো এটাই চেয়েছিলেন। রাজ্যে শান্তি বিরাজ করুক। প্রজারা থাকুক সুখে। প্রশাসন হোক কড়া। তাহলেই দন্ডের ভয়ে সাধারণ মানুষ ভয়

পরম্পরা

পাবে। ফলে রাজ্যে কেউ করবে না কোনও অপরাধ। রাম তাই চেয়েছিলেন। ঘটল সেটাই। তবুও তেমন খুশি হতে পারেন না রাম। ভাবেন, ভয়ে কেউ আসছে না অভিযোগ জানাতে, এমন নয় তো? কিন্তু কিসের ভয়! দণ্ডদাতা তো তিনি। তাহলে —

অধৈর্য হয়ে পড়েন রাম। তাই লক্ষ্মণকে ডেকে বলেন, যাও দেখে এসো তো, রাজ্যসভার বাইরে কোনও অভিযোগকারী আছে কিনা?

লক্ষ্মণ বাইরে এসে তন্ন তন্ন খুঁজেও কোনও অভিযোগকারীকে পেলেন না। সে কথাই জানান তিনি রামকে।

তবুও রাম বলেন, যাও না, আরও একবার ভালো করে দেখে এসো!

রামের কথায় রাজ্যসভার বাইরে আসেন লক্ষ্মণ। ফটকের বাইরে আসতেই একটা কুকুর জোরে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। কুকুরের ডাক শুনে লক্ষ্মণের মনে হয়, কুকরটা বোধহয় কিছু জানাতে চাইছে। লক্ষ্মণ তাই ওই কুকুরের কাছে এসে বলেন, কান্না থামান। আপনি নির্ভয়ে বলুন। কী চান আপনি।

এবার সরব হয় সেই কুকুর। জানায়, তার যা বলার, বলবে প্রজাপালক রামচন্দ্রকেই। কিন্তু কুকুর সে। রামচন্দ্রর অনুমতি ছাড়া সে ভেতরে যেতে পারে না। রামচন্দ্র যদি অনুমতি দেন, তাহলে তাঁর কাছে গিয়েই যা বলার বলবে।

লক্ষ্মণ ভেতরে গিয়ে সব জানান রামচন্দ্রকে। তিনি কুকুরকে রাজসভায় আনতে বললেন। লক্ষ্মণ তাই করে। কুকুর বলে, অকারণে এক ব্রাহ্মণ আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এর বিচার করুন আপনি।

রামচন্দ্রর নির্দেশে সেই ব্রাহ্মণকে সভায় আনা হলে ব্রাহ্মণ বলে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় অধীর হয়ে প্রচণ্ড রাগেই সে পথরোধকারী এই কুকুরকে মেরেছিল। তার জন্য যে কোনও শাস্তি নিতেই রাজি সে।

কুকুরই তখন তাকে কোনও মঠের

।। রামনবমী উপলক্ষে প্রকাশিত।।

মোহান্ত করে দিতে বলে। মঠাধীশ হলে ক্রোধের বশে আরও অন্যায় করবে এবং তাতে তার পরকালও নষ্ট হবে।

কুকুরের কথা মতোই রামচন্দ্র সেই ব্রাহ্মণকে এক মঠের মোহান্ত করেন।

ঘটনাটা ছোট, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, রামচন্দ্রের রাজত্বে শুধু মানুষ নয়, ইতর প্রাণীও পেত সুবিচার। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধেও অভিযোগ জানানোর অধিকার ছিল তার। রাম-রাজত্বের বর্ণনায় বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে (১১।৮-৯) বলা হয়েছে — সেসময় অযোধ্যায় — নাধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব রাম রাজ্যং প্রশাসতি' — রাম রাজ্যে না ছিল কোনও আধি, না ছিল ব্যাধি। পৃথিবী পরিপূর্ণ ছিল সে সময় শস্য এবং ঔষধিতে। ছিল না শিশু বা বালকমৃত্যু। মারা যেত না কোনও যুবক বা প্রৌঢ়। ধর্মানুসারে রাজ্য শাসিত হত। তাই কোনও বাধাই তখন আসত না কারও কাছ থেকে। সে কারণেই রাজসভাতেও আসত না কোনও অভিযোগকারী।

রাম-রাজত্বের এই বর্ণনা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে, রাজা হলেন সকলের কর্তা। তিনি নায়ক। তাই শুধু জাগ্রত অবস্থায় নয়। ঘুমন্ত অবস্থাতেও তিনি জাগ্রত অর্থাৎ সজাগ থাকেন। রাজা যদি প্রজাপালন না করেন, তাহলে বিনষ্ট হয় সব কিছুই। রাজা হলেন সকলের পিতা। তিনি প্রজাদের পালনকর্তা। রক্ষাকর্তা। কাল ও যুগও হলেন তিনিই। ধর্ম অনুযায়ী নিখিল বিশ্বকে পালন করেন ও সকলকে ধারণ করেন বলে রাজাই হলেন ধর্ম। এটাই হল বিজ্ঞজনের অভিমত। রাজা শত্রুদেরও ধারণ করেন। আবার ধর্মমতে প্রজার আনন্দবিধান করেন। আর এসবই তো ধারণ অর্থাৎ শাস্ত্রমতে ধর্ম। এই ধর্মের কাছে কোনও কিছুই দুষ্প্রাপ্য নয়। আর এই সব ছিল রামচন্দ্রর মধ্যে। তাই তিনি ধর্মাধিরাজও।

বাল্মীকির ওই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, রাম রাজত্বে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হত কৃষি, স্বাস্থ্য এবং শাসন ব্যবস্থার ওপর। সুস্থ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারণেই রাজ্যে ছিল না শিশু বা অকাল মৃত্যু। কৃষি ও সেচ ব্যবস্থায় জোর দেওয়ার ফলে রাজ্যে সবসময়ই ভাল ফসল ফলতো। ফলে

(এরপর ১২ পাতায়)

শ্রীরঙ্গমের অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তি কি সত্যিই শ্রীরামচন্দ্র পূজিত

সোমনাথ নন্দী

ভগবান শ্রী বিষ্ণুর রামরূপে অবতার গ্রহণের কারণ বেদ ব্রাহ্মণের (ঋষি) অনিষ্টকারী দুরাচারী রাক্ষসরাজ রাবনের বিনাশার্থে। একথা তো সমস্ত পুরাণ, রামায়ণ ও ইতিহাস স্বীকৃত।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয় সমাপ্ত হয় আনুমানিক খৃঃ পূর্বাব্দ ৭২৯৩-এ। লঙ্কাপতি রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের হাতে নিহত হন চৈত্র কৃষ্ণ চতুর্দশীতে বাল্মিকী রামায়ণ সূত্র অনুসারে। এরপর ভগবান শ্রীরাম নিজ ভক্ত তথা মিত্র রাবনানুজ বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে অধিষ্ঠিত করে বানর বীরগণ ও বিভীষণসহ ফিরে আসেন অযোধ্যায় চোদ্দ বছর বনবাসান্তে। অযোধ্যায় পুনর্রাজ্যাভিষেকের পর পরম মিত্র বিভীষণকে দর্শন করান রঘুবংশের কুলদেবতা অনন্তশায়ী মহাবিষ্ণু মূর্তিকে। রঘুনাথ বিভীষণকে বলতে থাকেন কীভাবে তাঁদের এই কুলদেবতা ইক্ষবাকুবংশে আসেন।

সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান বিষ্ণু সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে এই স্বপ্রকট বিগ্রহ দেন তাঁকে। ব্রহ্মা সেই বিগ্রহ দেন সূর্যদেবকে। সূর্য পরে উক্ত বিগ্রহ অর্পণ করেন নিজ বংশজ বৈবস্বত মনুকে। মনু হয়ে তা আসে অযোধ্যাপতি ইক্ষ্বাকুর হাতে। সেই থেকে বিগ্রহ হয়ে যায় ইক্ষ্বাকু বংশ তথা সূর্যবংশের কুলদেবতা। তদানুসারে মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা পূজিত হয় সেই বিগ্রহ।

বিভীষণ আবিষ্টের মতো শুনে যান বিগ্রহ আগমনের কাহিনী। অন্তরে উথলে ওঠে বিগ্রহ পাওয়ার বাসনা। অন্তর্যামী শ্রীরাম বুঝতে পারেন সখার ইচ্ছা। কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রঘুনন্দন সানন্দে সমর্পণ করেন সেই বিগ্রহ মিত্র বিভীষণকে।

লঙ্কায় ফেরার পথে বিভীষণ পথিমধ্যে কাবেরীতটে মনোরম রঙ্গদ্বীপকে দেখে

শ্রীরঙ্গম মন্দির।

নামেন বিশ্রামের জন্য। বিগ্রহকে রাখেন চন্দ্রপুষ্করিণী তটে। পুন্নাগ বৃক্ষের (নাগকেশর) তলায়। খবর পেয়ে উরয়ুর রাজ্যের রাজা ধর্মবর্মা আসেন বিগ্রহ দর্শনে ও পালন করেন ব্রহ্মোৎসব মহাধুমধামে। কারণ উক্ত দ্বীপ ছিল ধর্মবর্মার রাজ্যভুক্ত।

উৎসব শেষ হলে বিভীষণ আর তুলতে পারেন না বিগ্রহকে মাটি থেকে। বহু চেষ্টা করেও বিফল হন। শেষে দৈববাণী হয় ব্রহ্মাকে দেওয়া কথামতো তিনি (বিগ্রহ) থাকবেন এই চোল দেশে ৭০০ বছর। এখানে ধর্মবর্মার পূজা নেবেন রঙ্গনাথ নামে। তবে তাঁর সদা কৃপাদৃষ্টি থাকবে দক্ষিণে লঙ্কার উপর। বিরাজ করবেন দক্ষিণাস্য হয়ে। বিমর্ষ বিভীষণ অগত্যা ফিরে যান লঙ্কায়।

ধর্মবর্মা এরপর এখানে গড়ে তোলেন সুদৃশ্য এক মন্দির। বহুকাল পর তা লুপ্ত হয়ে যায় কাবেরীর প্রলয়ঙ্কর বন্যায়। মন্দির চলে যায় মাটির তলায়। কালের প্রভাবে মানুষও ভুলে যায় রঙ্গনাথজীর কথা। দ্বীপ ঢেকে যায় ঘন বনানীতে।

খৃস্টীয় প্রথম শতকে চোল রাজা কিল্লি চোল রঙ্গদ্বীপে শিকারে এসে শোনেন এক শুক পাখির একটি শ্লোকের বারবার পুনরাবৃত্তি।

কাবেরী হল পূণ্য বিরজা। শ্রীরঙ্গ নাথ প্রত্যক্ষ পরমপদ বাসুদেব।

সচকিত হয়ে ওঠেন রাজা। স্থান খনন করে উদ্ধার করেন রঙ্গনাথের বিগ্রহসহ প্রাচীন মন্দির। উল্লসিত কিল্লি চোল গড়ে তোলেন বিশাল মন্দির ক্ষেত্র। এরপর ১৪ শতকের প্রথম দশক অবধি মন্দিরের আকার ও আয়তন বৃদ্ধি পায় চোল, চেরা, পান্ড্য, নায়ক, পল্লব, বিজয়নগর প্রভৃতি রাজবংশের স্বতঃস্ফূর্ত আনুকূল্যে। চেন্নাই নগরী থেকে ৪২৪ কিমি দূরে তিরুচিরীপল্লী জেলায় কাবেরী ও কোল্লিদাম নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ শ্রীরঙ্গম বা রঙ্গদ্বীপে বিশ্ববিশ্রুত মন্দির নগরী তিরুবররঙ্গম বা শ্রীরঙ্গম। দ্বীপটি আয়তনে ১৮৭ বর্গ কিলোমিটার। দক্ষিণ ভারতীয়দের বিশ্বাস এই স্থান শ্রীদেবী বা মহালক্ষ্মীর নিত্য আবাসস্থল। পৌরাণিক বিচারে সারা ভারতে বিরাজিত শ্রীবিষ্ণুর ৮টি স্বয়ংব্যক্ত বিগ্রহ ক্ষেত্রের অন্যতম। সত্যিই বিশালতায়, প্রাচীনত্বে, অলঙ্করণে, ভাস্কর্যে, সর্বোপরি ঐতিহ্যে এমন অতুলনীয় মন্দির সারা ভারতে বিরল। প্যারিসের গুমেত মিউজিয়ামের নির্দেশক ও প্রসিদ্ধ কলাবিদ জেনি আঁবেয়ারও মন্দিরের শিল্পকলা দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ প্রত্নবিদ জে ফার্গুসন একইভাবে চমৎকৃত হয়ে বলেছিলেন — Vaisnava Temple at Srirangam is certanly the largest, and if its principle of design could be reversed, would be one of the finest temples in South of India (History of Indian & Eastern Architecture).

চতুর্ভুজাকৃতি রঙ্গনাথ মন্দিরের মোট আয়তন ৪ বর্গ কিমি। দক্ষিণের অন্যসব মন্দির যেখানে পূর্ব-পশ্চি মাভিমুখী, সেখানে এই মন্দিরের অবস্থান উত্তর-দক্ষিণমুখী। মন্দির প্রাঙ্গণে ১০৮টি নানা মাপের দেবসন্নিধি (ছোট মন্দির)। এর মধ্যে ৮ বিগ্রহ স্বপ্রকাশিত (মনুষ্য নির্মিত নয়)। আছে ৫০টি নাট মন্ডপ। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল — রঙ্গবিলাস, পাঙ্গুলি উত্তর, নবরাত্রি, অশ্ব ও সহস্রমন্ডপ

(এরপর ১৩ পাতায়)

বোধকথা

মরুভূমির পথিক

সতীনাথ রায়।। জীবনটা যে শুধু ঘড়ির কাঁটার হিসাবে চলে না সম্প্রদা সিং তাঁর নিজের জীবন দিয়ে কথাটা বার বার অনুভব করেছেন। ছোটোবেলা থেকেই জীবনের ওপর দিয়ে ঝড়-ঝঞ্ঝাট বয়ে গেছে। লেখাপড়ার জীবনটাতেও ভাগ্য বিড়ম্বনা কম জোটেনি। বিহারের জেহানাবাদের প্রত্যন্ত গ্রাম ওকরির সম্প্রদা একাধিকবার বিভিন্ন ঝুট-ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। বৃটিশ শাসনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি। বৃটিশ আমলে ক্রুদ্ধ জনতার মাঝে তিনিও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১১ বছর। এরপর বয়স যত বেড়েছে, বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি নিজেকে বেশি করে জড়িয়েছেন। স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিভিন্ন স্বার্থে তাঁকে ব্যবহার করেছে। সম্প্রদাও ভালো মন্দ না বুঝেই লোকের কথায় উঠেছেন, বসেছেন।

বি-কম পড়া শেষ করার পর তাঁর মনে হয়েছিল জীবনটা এভাবে চললে, ভবিষ্যৎ বড় কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

সেই থেকেই জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। কিন্তু কপাল মন্দ। কিছু টাকা ঋণ নিয়ে একটা পাম্পসেট কিনে নিজের জমিতেই চাষের কাজ শুরু করলেন তিনি। প্রথম প্রথম কৃষিতে আশার আলো দেখতে পেলেও, অল্পদিনের মধ্যে অনাবৃষ্টি আর প্রকৃতির উদাসীনতার শিকার হলেন সম্প্রদা। চাষের কাজ লাটে তুলতে হল। গ্রামের অন্যান্য চাষীদেরও প্রায় একই অবস্থা। সম্প্রদার মাথা থেকে চাষের চিন্তা চিরকালের জন্য বিদায় নিল। দিশাহীন সম্প্রদা কোথায় যাবেন কী করবেন কিছুতেই কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

একদিকে পরিবার-পরিজন; অন্যদিকে নিজের রোজগারে ভাটা পড়ায়, তিনি প্রথমে ভেঙে পড়লেও, ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছেন। নিজের সন্তান-স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটি স্কুলে কেরানির পদে কাজ

সম্প্রদা

শুরু করলেন। কিন্তু সেখানেও বিস্তর বাধা। ১০ দিনের জন্যই সে কাজ জুটেছিল তাঁর। ১০ দিনের কাজে আর কীই বা হবে — এই প্রশ্নটাই তাঁকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল। তিনি অচিরেই কেরানির কাজে ইস্তফা দিলেন। শুরু করলেন জমানো টাকা থেকে ছাতার পাইকারি ব্যবসা। তাও ১০ দিনের মধ্যেই লাটে উঠল। সম্প্রদার মানসিক চাপ আর অসন্তোষ দিনেক দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। দুর্দিনে মাথা কাজ করলেও, মন যেন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। ভারি বয়সে বেকারের তকমা নিয়ে চলার যে কী যন্ত্রণা সম্প্রদা সেকথা ভালো রকম অনুভব করেছেন। তবে দুর্দিনেও ভালো মানুষকে কাছে পাওয়া যায়। সম্প্রদাও পেলেন। মন্দের সময়ে বন্ধু সীতারাম সিং তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে ওষুধের ব্যবসার জন্য রাজি করান। ব্যবসার প্রয়োজনীয় মূলধনের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন আত্মীয় পরমেশ্বর সিং। সীতারামের পরামর্শে, আর আত্মীয়র দেওয়া মূলধনে ব্যবসা শুরু হল। কিন্তু এবারেও বিধাতা মুখ তুলে তাকালেন না। আবার ভাগ্য বিড়ম্বনা। ব্যবসা চলল না। অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেল। সম্প্রদা দুঃখ পেলেন কিন্তু আশাহত হলেন না। জীবনের কঠিন মরুভূমির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসব দুঃখ-কষ্ট আর যেন তাঁকে ভাবায় না। সম্প্রদা আবার স্বপ্ন দেখলেন।

জীবনে বড় হওয়ার মানসিকতা নিয়ে মুম্বাই পাড়ি দিলেন। মুম্বাই-এ পৌঁছে দু-তিন জনকে ব্যবসার সঙ্গী করে তিনি আবার ওষুধের ব্যবসা শুরু করলেন। ভগবানের কৃপায় ব্যবসার শুরুটা মন্দ হল না। যৌথ ব্যবসার মধ্যে যে অশান্তির সম্ভবনা বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায়, সম্প্রদার ব্যবসার ক্ষেত্রেও তাই হল। অল্পদিনের মধ্যেই ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব চরমে উঠল। তবে ততোদিনে তাঁর সাফল্যের বীজ বোনা হয়ে গেছে। সমস্ত ঝুট ঝামেলা এড়িয়ে তাঁর ওষুধের ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগল। আজ সম্প্রদা বড় ব্যবসায়ী। ঔষধ ব্যবসার মধ্য দিয়ে পরোক্ষে তিনি জনদরদী। সমাজসেবী।

ঘটনাটি সত্য। সম্প্রদার ওষুধ কোম্পানীর নাম 'অ্যালকেম ল্যাবরেটারিজ লিমিটেড'। ভারতের বড় ওষুধ কোম্পানির একটি।

জীবনে বিজ্ঞান

নির্মল কর

মানুষের লুকনো ঘড়ি

বিজ্ঞান এখন গাছ-পালা এবং প্রাণীদের স্বভাব চরিত্রের হাল-হদিস দিতে সক্ষম। এরা ঘড়ি মেপে কাজকর্ম করে। এহেন এক গোপন ঘড়ি, যা শরীরবৃত্তীয় কাজকর্মকে একটা নির্দিষ্ট ছন্দে বেঁধে রাখে। পরিযায়ী পাখিরা শীতের দেশ ছেড়ে কখন উষ্ণতার আশ্রয়ে উড়ে আসবে তা বলে দেবে ওই অদৃশ্য ঘড়ি। ইদানীং মানুষের শরীরবৃত্তীয় ছন্দকে চিকিৎসায় লাগানো হচ্ছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় ধরা পড়েছে, ডায়োবেটিস, হাঁপানি এবং উচ্চরক্তচাপের মতো অসুখ সঠিক সময়ে নির্দিষ্ট মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ করতে পারলে রোগী তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে।

সব শিশুই অভিমন্যু

মহাভারতে বর্ণিত অভিমন্যু যে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন যুদ্ধ -বিগ্রহের নানা কলাকৌশল এবং কূট রাজনীতির প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন, কথাটার মধ্যে বাড়াবাড়ি থাকলেও মার্কিন বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি বলেছেন, মাতৃগর্ভ থেকেই শিশুরা বাইরের জগতের সব কিছু জানার, শোনার, অনুভব করার এমনকী মনের আবেগ প্রকাশ করার ক্ষমতাও অর্জন করে।

গাছের রসে ডিজেল

ব্রাজিলের প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আমাজন অরণ্যে কোপা আইবা নামে রাবার প্রজাতির এক গাছের সন্ধান পেয়েছেন, যার থেকে নিঃসৃত রস ডিজেল তেলের অভাব পূরণ করতে পারে। প্রতি দু'ঘন্টায় এক একটি গাছ থেকে ৮ থেকে ১৫ লিটার পর্যন্ত রস নিষ্কাশিত হয়, যা সরাসরি যে কোনও ডিজেল-চালিত যন্ত্রে ব্যবহার করা যায়।

মিষ্টি কথা

মধুমেহ থেকে মেদবৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে চিনির বড্ড বদনাম। তবু চিনিকে এড়িয়ে চলাও দায়। সম্প্রতি চিনির সপক্ষে একটি দারুণ অজুহাত খাড়া করলেন বিজ্ঞানীরা। বেশি চিনি খেলে নাকি স্বভাব মিষ্টি হয়। মিষ্টি কিছু খেলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিফলন ঘটে মস্তিষ্কে। ফলে মুখ ফুটে বলা যায় মনের কথা। এমনটাও জানান বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে, মিষ্টি যাঁরা একেবারে এড়িয়ে চলেন বা কম খান, তাঁরা অধিক ক্ষেত্রে গতে-বাঁধা বৈচিত্র্যহীন জীবন কাটান।

রোবো কিউ

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম রোবট 'রোবো-কিউ'কে পেশ করা হল ইয়োকোহামায় আয়োজিত রোবো জাপান ২০০৮ প্রদর্শনীতে। এবছর রোবো কিউ-কে জাপানের বাজারে আনবে টমি কোম্পানী। আয়তনে ৩.৪ সেন্টিমিটার। বড় জোর একটি বুড়ো আঙুলের সমান। এটি দু'পায়ে হাঁটবে, চলবে। ক্ষুরধার বুদ্ধি নিয়ে চটজলদি জটিল ভেল্কি দেখাবে আর জটিল সমস্যার সমাধান করে দেবে। এমনকী অনায়াসে ফুটবলও খেলবে।

রামায়ণের রাজধর্ম

(১১ পাতার পর)

রাজ্যে যেমন খাদ্যাভাব ছিল না। তেমন মানুষের আর্থিক অবস্থাও ছিল উন্নত। সেই রাজ্যের প্রশাসন ছিল অত্যন্ত কঠোর। রাজকর্মচারীরা প্রত্যেকেই নিজের কাজটা করতো ঠিক ঠিক ভাবে। রাজকর্মচারীরা সৎ ও নীতিপরায়ণ হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষও অন্যায় করতে ভয় পেতো। সে কারণেই কেউ রাজ্যসভায় আসত না কোনও অভিযোগ জানাতে। আর এসবই সম্ভব হয়েছিল রাজা নিজে সৎ, ধার্মিক, নীতিনিষ্ঠ হওয়ায়। শাস্ত্রসম্মত পথে রাজ্য শাসন করতেন তিনি।

রাজা একইসঙ্গে ছিলেন প্রজাপালক এবং ধর্মরক্ষক। আর তাই মৃত বালক পুত্রটা নিয়ে এসে ব্রাহ্মণ যখন তাঁর পুত্রের অকাল মৃত্যুর জন্য রামকেই দায়ী করলেন তখন তিনি ক্রুদ্ধ হলেন না। বরং সেই মৃত বালককে তেলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে রাজ্যে কোনও অন্যায় অবৈধ কাজ হচ্ছে কিনা তা তদন্ত করে দেখার জন্য আজই বেরিয়ে পড়লেন। অনেক অনুসন্ধানের পর দেখলেন শূদ্র হয়েও শম্বুক ব্রাহ্মণের মতোই কঠোর তপস্যা করছে। আর সেই পাপেই ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যু হয়েছে। তখন অন্য আর কিছু বিবেচনা না করেই শম্বুককে বধ করেন রামচন্দ্র। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ ফিরে পায় সেই মৃত বালক।

এই ঘটনার মধ্যে কেউ কেউ অলৌকিকত্ব দেখতে পান। শম্বুক বধকে রামের অন্যায় কাজ বলেও চিহ্নিত করেন কেউ কেউ। কিন্তু একটু শান্তভাবে পর্যালোচনা করলে দুটি ঘটনাতেই ভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। প্রথমত, যে বালককে মৃত বলে আনা হয়েছিল সে হয়তো কোমায় চলে গিয়েছিল। তৈল দ্রোবনিতে নানা গন্ধ দিয়ে ডুবিয়ে রাখাটা হয়তো আধুনিক 'ভেন্টিলেশন' ও 'আই সি ইউ' তে রেখে চিকিৎসা ব্যবস্থার বিকল্প। সেই ব্যবস্থাতেই প্রাণ ফিরে পায় বালক। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা যায়, কোনও আইন, তা যেমনই হোক, বলবৎ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করলে অপরাধীকে শাস্তি পেতেই হয়। এবং শম্বুক তেমনই একটি আইন ভাঙার জন্যই ওইভাবে দন্ডিত হয়েছিল। যাই হোক, রামরাজত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়ার পর রাজার কর্তব্য বা ধর্ম সম্পর্কে স্বয়ং রামচন্দ্র কী বলেছেন তা একবার শোনা যাক। বনবাসকালে চিত্রকূট পাহাড়ে এসে রামকে অযোধ্যায় ফিরে যেতে অনুরোধ করেন ভরত। পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রাম সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তার আগে ভরতের ও অযোধ্যার কুশল জানার জন্য রাম যে যে প্রশ্ন করেছিলেন তার মধ্য থেকেই রাজধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণার একটা হদিশ পাওয়া যায়। (২।১০০।১০—৭৬)

রাম জানতে চান, সৎকুল জাত পণ্ডিত, হিংসাহীন, তপস্যাপরায়ণ সত্যদ্রষ্টা পুরোহিতদের সঙ্গে ঠিক ঠিক ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা? জানতে চান, দেবতা, গুরু পুরোহিত থেকে বাড়ির কাজের লোক পর্যন্ত সকলকেই সম্মান জানানো হচ্ছে কিনা? বীর, বিদ্বান, জিতেন্দ্রিয়, সৎবংশজাতদের মন্ত্রী করা হচ্ছে কিনা, ইত্যাদি।

রামের ওইসব প্রশ্নের সারকথা হল, দেবতা থেকে সামান্য ভৃত্য পর্যন্ত সকলকেই সমান সম্মান জানাতে হয়। কোনও গোষ্ঠীর নেতা হলেই হবে না সুপণ্ডিত, অভিজ্ঞ উপযুক্ত ব্যক্তিকেই মন্ত্রীপদে নিয়োগ করতে হয়। যখন তখন ঘুমিয়ে পড়তে নেই। কখনই একা বা বহুলোকের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে নেই। মন্ত্রগুপ্তি রাজধর্মের একটা বড় অঙ্গ। তাই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা আগে জানাতে নেই। অসংখ্য মূর্খকে প্রতিপালন করার চেয়ে একজন পণ্ডিতকে প্রতিপালন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। যে যে কাজের উপযুক্ত তাকে দিয়ে সেই কাজ করাতে হয়। ঘুষ খোরদের রাজকর্মচারী পদে নিয়োগ করা উচিত নয়। প্রজাদের কখনই কঠোর দণ্ড দিতে নেই। সাম-দান-ভেদ-দণ্ড ইত্যাদি রাজনীতির নিরীখে কর্মীদের মন জয় করতে হয়। সেনা অসন্তোষ এড়ানোর জন্য সময়মতো তাদের রসদ ও বেতন দেওয়া উচিত। এইভাবে দূত নিয়োগ, আত্মীয় পালন, পর্যুদস্ত শত্রুদেরও দুর্বল না ভাবা, শস্ত্রবিদদের শ্রদ্ধা করা, ভোগবাদীদের গুরুত্ব না দেওয়া, নগরদ্বার সুরক্ষিত রাখা, নদী জলের সেচব্যবস্থা, কৃষক গোপালক প্রভৃতির প্রতি সদয় ব্যবহার করা, বণিকদের বাণিজ্য করার সুব্যবস্থা করা, হাতি প্রভৃতির জন্য বনভূমি রক্ষা, বেশি আয় ও অল্প ব্যয় করা, শাসনকাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, শাস্ত্রকুশল, ধার্মিক বিচারক নিয়োগ করা, নির্দোষ নিরীহ মানুষ যাতে অত্যাচারিত বা শাস্তি না পায় তা সুনিশ্চিত করা। বিনয়ী হওয়া — অর্থ, কাম ও ধর্মকে যথাযথভাবে বিভক্ত করে সময়মতো সমানভাবে তাদের সেবা করা ইত্যাদি হল প্রকৃত রাজধর্ম বা রাজকর্তব্য।

রাম আরও বলেন, নাস্তিক্য, ক্রোধ, অনধাবনতা, দীর্ঘসূত্রতা — এই কয়টি এবং জ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা না করার নাম আলস্য। এই আলস্য সবসময় পরিহার করতে হয়। সব শত্রুর সঙ্গে একসঙ্গে যুদ্ধ করতে নেই কখনই। মৃগয়া, পাশাখেলা ইত্যাদি দশটি কামজ দোষ পরিহার করতে হয়। এছাড়া যুদ্ধের প্রস্তুতি, সন্ধি ও বিগ্রহ সম্পর্কে সচেতন থাকা, দুর্গরক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কেও তৎপর থাকতে বলেন রামচন্দ্র। রামায়ণে স্বয়ং রামচন্দ্র যেমন রাজধর্মের কথা বলেছেন, তেমনই রাজধর্ম ও রাজার গুণ সম্পর্কে বলেছেন মার্কণ্ডেয়, মেশ্চাল, বামদেব, কশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম, জাবল প্রমুখ অযোধ্যার মন্ত্রীরাও। তাঁরা বলেন, অরাজক দেশে ধন থাকে না, ভার্যাও গৃহে বাস করে না, ঠিক ঠিক চাষবাস হয় না, নাগরিকদের ধন ও জীবনও নিরাপদ থাকে না। অরাজক রাজ্যে সেনা শৃঙ্খলা থাকে না। তারা লোভী হয়। ফলে পদে পদে থাকে অন্য রাজার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়। এখানে মানুষ হয় অধার্মিক। বলবানরা দুর্বলের সবকিছু আত্মসাৎ করে। তাঁরা বলেন, প্রকৃতপক্ষে রাজাই সত্য, রাজাই ধর্ম, রাজাই পিতামাতা, ধর্মরক্ষক — রাজা সত্যঞ্চ ধর্মশ্চ রাজা কুলবতাং কুলম্। রাজা মাতা পিতা চৈব রাজা হিত করো নৃণাম্।। (২।৬৭।৩৪)

রামায়ণের রাজধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে শূর্পনখাও। রারণকে স্বৈরাচারী বলে অভিযুক্ত করে শূর্পনখা বলে, যে রাজা সময়ে নিজের কর্তব্য পালন করে না, সে ধ্বংস হয়ে যায়। রাজকার্যে শিথিল গোপনচারী, কানপাতলা রাজাকে প্রজারা ত্যাগ করে। অধীনদের যে রাজা রক্ষা করে না তার মান-সম্পদ রাজ্য কিছুই বৃদ্ধি পায় না। যে রাজার গুপ্তচর, ধনাগম এবং রাষ্ট্রনীতি অন্যের দখলে যায় তার পতন অবশ্যম্ভাবী। যে রাজা অপ দান করে, তীক্ষ্ণ স্বভাব, প্রমত্ত, গর্বিত, প্রবঞ্চক — সে বিপদে পড়লে প্রজারা তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে না। যে রাজা সদা সতর্ক সর্বজ্ঞ এবং জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ — তিনিই চিরকাল থাকেন। নীতির চোখ দিয়ে যিনি দেখেন, যাঁর ক্রোধ এবং প্রসন্নতা তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় — তিনিই সকলের পূজনীয় রাজা। রাবণের প্রতি ক্ষোভের বাণ বর্ষণ করতে করতে শূর্পনখা প্রকৃত রাজধর্মের কথাই বলেন।

এইভাবে রাজধর্ম সম্পর্কে রামায়ণের বিভিন্ন জায়গায় যেসব কথা আছে তা কিন্তু আজও সমান প্রাসঙ্গিক। রামচন্দ্রের রামরাজ্য আজও যে কোনও সাধারণ নাগরিকের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন সফল করার দায়িত্ব যাঁদের সেই রাজনীতিকরা কি এ সম্পর্কে সত্যিই আন্তরিক? :

গত লোকসভা ভোটে সাড়ে পাঁচ হাজার প্রার্থীর মধ্যে ৪২১৮ জনের জমানত বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৫৪৩টি আসনে ৫৪৩৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাদের মধ্যে ৪২১৮ জন জামানত খুইয়েছেন। ওইসব প্রার্থীরা মোট বৈধ প্রদত্ত ভোটের ৬ ভাগের এক ভাগও ভোট পাননি। সকল প্রার্থীদের মধ্যে ১৩৫১ জন ৬টি জাতীয় রাজনৈতিক দলের। ৮০১ জন রাজ্য পর্যায়ের রাজনৈতিক দলের। অন্যদের মধ্যে অস্বীকৃত নথিভুক্ত রাজনৈতিক দলের ৮৯৮ জন প্রার্থী এবং ২৩৮৫ জন ছিলেন নির্দল প্রার্থী।

যেসব প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে তাদের মধ্যে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির ৫৪১ জন, রাজ্য পর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলির ৪৪০ জন, অস্বীকৃত নথিভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থী ৮৬৭ জন এবং ২৩৭০ জন নির্দল। ১৫ জন নির্দল প্রার্থী গত লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। সব মিলিয়ে ৫৪৩৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭৭.৬ শতাংশ-এর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

ভোট প্রাপ্তির হিসাবে দেখা যায় গত লোকসভা নির্বাচনে ৬টি জাতীয় দলের প্রার্থীরা পেয়েছেন প্রদত্ত ভোটের ৪০ শতাংশ। ৬টি জাতীয় রাজনৈতিক দল হল- বি এস পি, বি জে পি, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, সি পি আই (এম), সি পি আই এবং জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি (এন সি পি)। ৩৬টি রাজ্য পর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থীরা পেয়েছেন ৫৫ শতাংশ ভোট। ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে অস্বীকৃত নথিভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থীদের মধ্যে ৯৬.৫ শতাংশ এবং নির্দল প্রার্থীদের মধ্যে ৯৯.৩৭ শতাংশই তাদের জামানত হারিয়েছেন।

রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় উত্তরপ্রদেশে সবচাইতে বেশি প্রার্থী জামানত খুইয়েছেন ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে। ওই রাজ্যে মোট ১১৩৮ জন প্রার্থী ৮০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাদের মধ্যে ২৪২ জন ৬টি জাতীয় রাজনৈতিক দলের, ১১৮ জন রাজ্যভিত্তিক রাজনৈতিক দলের, ২৯৭ জন অস্বীকৃত নথিভুক্ত রাজনৈতিক দলের এবং বাকি ৪৮১ জন নির্দল প্রার্থী। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে ৯০৭ জনই জামানত হারান। তাদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় দলগুলির ৯১ জন, রাজ্য

দলগুলির ৪২ জন, অস্বীকৃত নথিভুক্ত দলগুলির ২৯৪ জন এবং নির্দল প্রার্থী ৪৮০ জন। ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তামিলনাড়ুতে ৩৯টি কেন্দ্রে ৫৭১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাদের মধ্যে ৪৯৩ জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। জাতীয় দলগুলির ৫০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩১ জন, রাজ্যস্তরের দলগুলির ৯০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩১ জন, অস্বীকৃত নথিভুক্ত দলগুলির ৪০ জন প্রার্থী ও ৩৯১ জন নির্দল প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বিহারে ৪০টি লোকসভা কেন্দ্রে ২০০৪ সালের নির্বাচনে ৪৬২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাদের মধ্যে জামানত খোয়া যায় ৩৭৫ জন প্রার্থীর। ২০০ জন নির্দল প্রার্থীর মধ্যে মাত্র চারজনের জামানত রক্ষা পায়। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির ৪৪ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৬ জনের জামানত রক্ষা পেয়েছে। রাজ্যভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলির ৬৭ জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে বিহারে।

পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রে ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৫৭৭ জন প্রার্থী জামানত হারিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে ২৬৮ জন এবং মহারাষ্ট্রে ৩০৯ জনের জামানত জব্দ হয়। মধ্যপ্রদেশে ২৯টি লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন মোট ২৯৪ জন। তাদের মধ্যে ২৩২ জনেরই জামানত খোয়া যায়। অন্ধ্রপ্রদেশে ৪২টি লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ২৭৯ জন। তাদের মধ্যে জামানত হারান ১৯৫ জন। ঝাড়খন্ডে ১৫২ জন, হরিয়ানায় ১৩৭ জন প্রার্থী ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জামানত হারিয়েছেন। রাজস্থানে ১৮৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট না পাওয়ায় তাদের মধ্যে ১৩৪ জন প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়। উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনে প্রত্যেক প্রার্থীকে দশ হাজার টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হয়। পাঁচ হাজার টাকা দিতে হয় তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতি প্রার্থীদের। মনোনয়নপত্র জমা দেবার সময় প্রার্থীদেরকে ওই জামানত দিতে হয়। যদি কোনও প্রার্থী প্রদত্ত বৈধ ভোটের ৬ ভাগের এক ভাগও না পান তাহলে তার গচ্ছিত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে। ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের আরও তথ্য পাওয়া যাবে পি আই বি ওয়েবসাইটে।

ওয়েবসাইটের নাম হল (www. Pib.nic.in.Election 2009)

বাজপেয়ীর ভাষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বাজপেয়ীর ভাষণকেই দলীয় প্রচারে ব্রহ্মাস্ত্র বানাচ্ছে বিজেপি। বাজপেয়ী রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিলেও, দলের ভিতর-বাইরে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা আজও সমান অক্ষুন্ন।১৯৮৩ সালে তিনি দলের জাতীয় কাউন্সিলে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তারই কিছু অংশ দলীয় বৈদ্যুতিন বিজ্ঞাপনের অন্তর্ভুক্ত করছে দল। দলীয় কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করতেই বাজপেয়ীজীর ভাষণকে পাথেয় করছে বিজেপি। খুব শীঘ্রই মুম্বাইয়ের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞাপনটি সম্প্রচারিত হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। এক মিনিটের থেকে কিছু বেশি সময়ের এই বিজ্ঞাপন নিয়ে দল রীতিমতো আশাবাদী। দলের সব শ্রেণীর নেতার মধ্যে তা ভালো প্রভাব ফেলব বলে মনে করা হচ্ছে। ওই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে বাজপেয়ীর "অন্ধেরা ছুটেগা, সুরজ উগেগা, কমল খিলেগা," (অন্ধকার কেটে যাবে, সূর্যোদয় হবে, পদ্মফুল ফুটবে) উদ্ধৃতিটিও রাখা হচ্ছে। সেই সঙ্গে থাকছে বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং, সুষমা স্বরাজ, বেঙ্কাইয়া নাইডু, অরুণ জেটলির মতো প্রবীণ নেতাদের ছবিও।

শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণুমূর্তি শ্রীরামচন্দ্রের পূজিত ?

(১১ পাতার পর)

(সর্ববৃহৎ ও ৯৮৩ স্তম্ভযুক্ত)।

পরম্পরাগত দ্রাবিড় শিল্পশৈলীতে তৈরি হলেও মন্দিরের বিভিন্ন অংশে চোল, চেরা, পান্ড্য, পল্লব, হয়সাল, নায়ক ও বিজয়নগর শিল্পরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। স্বর্ণমন্ডিত শ্রীকৈল (গর্ভগৃহ) ঘিরে ২১ টি গোপুরম বা দ্বারশীর্ষ যুক্ত ৭ প্রাকারের সাথে। প্রাকারগুলির পরিচিতি যথাক্রমে ত্রিবিক্রম, অকলঙ্ক, আলিনাদন, কুলশেখরন, রাজমহেন্দ্রণ ও ধর্মবর্মা। নামগুলির মধ্যেই প্রকাশিত নির্মাতাদের দীপ্ত স্মৃতি। গোপুরমগুলির মধ্যে আছে উত্তরে ৭, দক্ষিণে ৬, পূর্বে ৪ ও পশ্চিমে ৩ এবং শ্রীকৈলের সামনে ১টি। উন্নত দ্রাবিড় শিল্পকলার অনবদ্য স্মারক। ৭১ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট কোবিল বা রাজাগোপুরমটি মন্দিরের প্রথম প্রাকারের দক্ষিণ দ্বারাদেশে দাঁড়িয়ে। যা এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের বিস্ময়ের বস্তু।

মন্দিরের প্রথম থেকে ষষ্ঠ প্রাকারের মধ্যে রয়েছে পুরোহিতদের বাসস্থান, ধর্মশালা, বাজার, বিভিন্ন দেবদেউল, উদ্যান, পুষ্করিণী, সুদর্শন ভগবানের জাগ্রত মন্দির, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবক্তা রামানুজ স্বামীর ৮০০ বছরের মন্দির, বঙ্গনায়িকী (মহালক্ষ্মী) মন্দির ও মন্ডপ, পুন্নাগ বৃক্ষ ও সোনার পাতে মোড়া ধ্বজস্তম্ভ। সপ্তম প্রাকারের পরই আছে ক্ষেত্রাধিপতি রঙ্গনাথস্বামীর গর্ভমন্দির ও অর্চাবিগ্রহ। যা এক সময়ে ছিল শ্রীরামচন্দ্রের পূজিত কুলদেবতা।

গর্ভমন্দির বা শ্রীকৈলের দরজা দক্ষিণে। ভিতরে দ্বিভুজ অনন্তশায়ী (শেষনাগের উপর শায়িত) বিষ্ণুমূর্তি শ্রীরঙ্গনাথ বা পেরিয় পেরুমল (তামিলে)। সারা অঙ্গে চোখ ঝলসানো রত্নভূষণ। পদপ্রান্তে সেবারতা দুই লক্ষ্মী মূর্তি। শ্রীদেবী ও ভূদেবী। মূল বিগ্রহের সামনে শ্রীদেবী ও ভূদেবীসহ রঙ্গনাথের সোনার চতুর্ভুজ উৎসব বিগ্রহ। নাম কস্তুরী রঙ্গনাথ বা পেরুমল।

রঙ্গনাথের বিগ্রহ যে অতি প্রাচীন সেকথা বলা হয়েছে বিভিন্ন পুরাণে। গরুড়, ব্রহ্ম, ব্রহ্মান্ড, মৎস্য পুরাণ ও রামায়ণে রঙ্গনাথ মাহাত্ম্যের উল্লেখ দেখা যায়। ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতার নিরীখে প্রাচীনত্বের প্রমাণ দেখা যায় খৃস্টীয় প্রথম শতকে রচিত তামিল কাব্য — অহনানূরুতে। তারপর শিলপ্পদিহারম্ নামক জৈন কাব্যে। পরবর্তী পর্যায়ে ৫ম থেকে ৮ম শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত ১১ জন সিদ্ধ বৈষ্ণব বা আড়বার রচিত নালাইরা দিব্য প্রবন্ধমে। সেখানে রঙ্গ নাথজীর স্তুতি হয়েছে নানা বর্ণময় ছন্দে। নানাভাব ব্যঞ্জনায় ৯ম শতকে রচিত রামানুজ স্বামী রচিত 'রঙ্গগদ্য' আর একটি উল্লেখনীয় নিদর্শন। সনাতন হিন্দু শাস্ত্রে ভারতে যে আট স্বয়ংব্যক্ত বিগ্রহের কথা বলা হয়েছে সেখানে রঙ্গনাথ স্বামীর নাম সর্বাগ্রে।

রঙ্গনাথ মন্দিরের সর্বাপেক্ষা অনুভূত বিষয় হল তার আধ্যাত্মিক স্পন্দন। দেবালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ মাত্র এক অপূর্ব শুদ্ধ সত্ব আপামর দর্শনার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত হয় অলক্ষ্যে। সেই জন্য ফার্গুসন সাহেব সচেতনভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তার বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ। হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান এ্যান্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার গ্রন্থে – One of the great charms of this temple, when I visited it, was its purity.

চাই রিয়েল প্রাইম মিনিস্টার — আদবানী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে দেশের স্বার্থকেই বড় হিসাবে তুলে ধরলেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী এল কে আদবানী। গত ২৬ মার্চ অসমের তিনসুকিয়ায় (Tinsukia) এক নির্বাচনী জনসভায় পূর্বের মতো এবারও দেশের স্বার্থে প্রকৃত প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের জন্য জনগণকে আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রীর মতো দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদের যাতে অবমাননা না হয়, সে বিষয়ে তিনি জনগণকে সচেতন করেন। শ্রীআদবানী বলেন, প্রধানমন্ত্রীই হচ্ছেন সরকারি নেতৃত্বের মূল নিয়ন্ত্রক। তিনি যেন প্রকৃত প্রধানমন্ত্রী (রিয়েল প্রাইমমিনিস্টার) হন। কোনও ড্যামি বা নকল প্রধানমন্ত্রী যেন না হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি এন ডি এ-র কথা তুলে ধরে বলেন, সেসময় দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন প্রকৃতই ক্ষমতাশালী। কিন্তু ইউপিএ সরকারের মূল নিয়ন্ত্রক সরকার স্বয়ং নন, ১০ নম্বর জনপথবাসিনীই সরকারের চালিকা-শক্তি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সরকারের চালিকাশক্তি হিসাবে সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়টি ইতিমধ্যে মিডিয়ার বিভিন্ন সমীক্ষা ও সংবাদে প্রমাণিত। লক্ষণীয়, আদবানী তাঁর বক্তব্যে নিজেকেই প্রকৃত হওয়ার যোগ্য বলে কোথাও জাহির করেননি। তিনি জনগণকে প্রকৃত প্রধানমন্ত্রী রূপে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকেই নির্বাচিত করতে বলেছেন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা এটা আদবানীর উদার রাজনৈতিক মানসিকতারই পরিচয় বলে মনে করছেন।

অগপ-বিজেপি জোট পাকা হবার পর অসমে আদাবানীর এটা প্রথম নির্বাচনী র‍্যালি ছিল। সভায় সাধারণ মানুষের ভিড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো। নির্বাচনে অসমে অগপ-বিজেপি জোট ভালো ফল করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এ এফ সি কাপের থেকে কি আই লিগ বড়

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কূপমুন্ডক মানসিকতা থেকে এখনও বেরোতে পারল না কলকাতা তিন প্রধান। কলকাতা লিগ, জাতীয় লিগ জেতাকেই সর্বোচ্চ প্রাপ্তি মনে করে নিজেরা তো ডুবছেই, সেই সঙ্গে নিঃস্ব দরিদ্র করে দিয়ে যাচ্ছে বাংলার ভাবি ফুটবল প্রজন্মকে। তিন প্রধানের মতো বাংলার শহর, মফঃস্বল গ্রাম-গঞ্জের সব ক্লাব, স্কুলের উদীয়মান ফুটবলাররা জীবনের পরম লক্ষ্য মনে করে লিগ, শিল্ড, ফেড কাপ, জাতীয় লিগ খেতাব এবং সেভাবেই তারা তৈরি হয়। অন্যদিকে গোয়ায় ছেলেরা আরও বৃহত্তর ক্যানভাসে জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। দেশের হয়ে খেলা, আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্যে তারা অভিনিবিষ্ট।

সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত রাজ্যের দুই সেরা ক্লাবের মানসিকতা ও পারফরমেন্স। সোয়াব ডেম্পো ক্লাব যারা দু'বার পরপর জাতীয় লিগ জিতে ফেলেছে তারা এখন সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। এবছর জাতীয় লিগে তাদের পারফরমেন্স আহামরি নয় এবং তার জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ বা শিল্প কর্তাদের কোনও হেলদোল নেই। বরঞ্চ এ এফ সি কাপকে পাখির চোখ করে তারা আন্তর্জাতিক মঞ্চে অভিষিক্ত হয়ে একটা পূর্ণবৃত্ত রচনা করতে চাইছে। অন্যদিকে মোহনবাগানকে দেখুন। আই লিগ খেতাবের জন্য এ এফ সি কাপে যেমন-তেমন করে টিম গড়ে মাঠে নেমে অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষ পেয়েও জিততে পারল না। সিরিয়ায় গিয়ে তবু কঠিন পরিস্থিতিতে খানিকটা লড়াই দিয়েছিল, কিন্তু ঘরের মাঠে জর্ডনের ক্লাবের বিরুদ্ধে ডাহা ফেল।

দুটি আন্তর্জাতিক ম্যাচের হারের পর মোহন কোচ করিম বেঞ্চারিকা কি বললেন? জাতীয় লিগের দিকে তাদের পুরো ফোকাস থাকায় এ এফ সি কাপের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নেননি। ব্যারেটো চোট পাওয়ায় যাননি। অন্যদের মধ্যে একমাত্র বাইচুঙ ভুটিয়া ছাড়া বাকি কারুর মধ্যে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নেমে যে ধরনের উদ্যম ও তাগিদ প্রত্যাশিত তার কণামাত্র ছিল না। সবাই কোচের চিন্তা-চেতনার প্রতি দায়বদ্ধ এটাই প্রমাণ করতে মাঠে নেমেছিল। ক্লাব কর্তারাও ফুটবলারদের বোঝাতে ব্যর্থ যে আন্তর্জাতিক স্তরে এই ধরনের টুর্ণামেন্টে ভাল ফল করলে, পরবর্তীকালে বহু দেশে প্রদর্শিত ম্যাচ খেলার আমন্ত্রণ আসবে। যেমন হয়েছিল ৭৭-৭৮ দু'বছর। বিশ্বখ্যাত কসমস ও সোভিয়েত রাশিয়ার বিখ্যাত ক্লাব অরারাতের সঙ্গে দুরন্ত খেলার পরিণতিতে এশিয়ার একাধিক দেশে মোহনবাগানকে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। যার ফলে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, মোহনবাগানের পাশাপাশি ভারতীয় ফুটবলও বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল,

এ এফ সি কাপের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী— মোহনবাগান ও জর্ডনের দল

গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল এদেশের ফুটবল সমাজের।

ঠিক এই জায়গাতেই ডেম্পো কর্তা ও কোচ হারিয়ে দিলেন মোহনবাগানীদের। ডেম্পো মোহনবাগানের মতো পাবলিক ক্লাব নয়। পুরোপুরি একটা অফিস ক্লাব। গোয়ার গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান ডেম্পোর তিন প্রধানের মতো লাখো সমর্থক সদস্য নেই। তাই ক্লাব তথা অফিস কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে দল গড়তে পারেন ও

সেই লক্ষ্যে পরিচালিত করতে পারেন। এবছর তাদের লক্ষ্য— এ এফ সি কাপের ফাইনাল খেলা। গত বছর প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে এই টুর্ণামেন্টে তারা সেমিফাইনালে উঠেছিল। এ এফ সি কাপের ভূতপূর্ব চাম্পিয়ন বাহারিনের আল মুবারক ক্লাবকে হারিয়েও দিয়েছিল তারা একটি ম্যাচে। যদিও সেমিফাইনালে তাদের হারাতে হয়েছিল অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী জর্ডনের আল হাসান ক্লাবের বিরুদ্ধে। এবছর তাই কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে ধাপে ধাপে এগোতে চাইছে তাঁরা।

আপাতত নিজেদের গ্রুপে অপরাজিত ডেম্পো। সিরিয়া ও জর্ডনের চাম্পিয়ান ক্লাবকে হারিয়ে গ্রুপে এক নম্বরে রয়েছে ডেম্পো। সেমিফাইনালে ওঠা তাদের পক্ষে বিশেষ সমস্যার হবে না। তবে সেমিফাইনালেই তাদের দৌড় থেমে যাক এটা তাদের কাম্য নয়। তাই সেমিফাইনালে যে দলই প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা দিক, তার জন্য আগাম পরিকল্পনা ও স্ট্রাটেজি তৈরি ডেম্পো কোচ আর্মান্দো কোলাসোর। এ এফ সি কাপ ফাইনালে উঠলে গোয়া তথা ভারতীয় ফুটবল জাতে উঠে যাবে এ বোধ থেকেই ডেম্পো আই লিগকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে বছরের শুরু থেকেই বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের আসিয়ান কাপ জেতার পর যে উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ লাল হলুদ কর্তারা। ওই সাফল্যের পর তরতরিয়ে এগিয়ে যাবার কথা ভারতীয় ফুটবলের। কিন্তু ফেডারেশন কর্তারা কোনওরকম উদ্যোগই নিলেন না। তারপর সাম্প্রতিককালে দু-দুটি এশিয় স্তরের মাঝারি মাপের টুর্ণামেন্ট জিতেছে ভারত। তারও কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

আন্তর্জাতিক স্তরে ঘনঘন ম্যাচ খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চি ত ভারতীয় ফুটবলাররা। দুটি টুর্ণামেন্ট জেতার পর অনেক কাজ করা যেত। বিদেশে বেশ কিছু টুর্ণামেন্টের অফার ছিল, প্রীতি সফরও করা যেত দূরপ্রাচ্য কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে। এতদ্বারা অনেকটাই সমৃদ্ধ হত ঘরোয়া ফুটবল সমাজ। ভাবি প্রজন্ম বিশেষ করে অভিজাত সমাজ ফুটবলে আকৃষ্ট হত। সাত-আটের দশকে সারা দেশে যেমন ফুটবল আবেগ, উদ্দীপনা ও জনজোয়ার ভেসে যেত, সেই উন্মাদনা ফিরে আসত। অথচ মোটামুটি সাফল্যের পরও ফুটবল যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই পড়ে রইল।

ডেম্পো এবং গোয়ার ফুটবল কর্তারা সেদিক থেকে অনেক আধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তার শরিক। জাতীয় দলে যেমন গোয়ানিজ ফুটবলারের সংখ্যাধিক্য তেমনি সুযোগ পেলেই গোয়ার ক্লাবগুলি বিদেশে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে আসে। আর আন্তর্জাতিক স্তরে ক্লাব পর্যায়ের যে কোনও টুর্ণামেন্ট খেলার জন্য কোচ, ফুটবলারদের মধ্যে বাড়তি আবেগ ও দেশপ্রেমের সঞ্চ ার হয়। এই দেশপ্রেমের অভাবেই বাংলার ফুটবল একটা জায়গায় আটকে আছে। তার ফল দেখা যাচ্ছে জাতীয় লিগেও। পরপর চারবছর জাতীয় লিগ আসেনি কলকাতায়।

আন্তর্জাতিক ম্যাচে সাফল্য এলে জাতীয় পর্যায়েও তার প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন দেখা যাচ্ছে ডেম্পোর ক্ষেত্রে। তাই ডেম্পোকে দৃষ্টান্ত করে উঠে আসুক কলকাতার ফুটবল।

শব্দরূপ - ৫০৩

চন্দ্রিমা গাঙ্গুলি

১			২		■	■	৩
	■	■		■	৪		
৫	৬	■	৭	৮	■	■	
■		■	■	৯		১০	
১১			১২	■	■		■
	■	■	১৩	১৪	■	১৫	১৬
১৭			■		■	■	
	■	■	১৮				

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. উঠ গো — — উঠ আদি, জগত জন পূজ্যা, ৪. তৎসম শব্দে পাখির ডানা, ৫. লক্ষ্মী দেবী, ডাকনামে সুচিত্রা সেন, ৭. একই শব্দে পৃথিবী, জল, বুধ পত্নী, ৯. ঈশ্বর, ব্রহ্মা, চিরবর্তমান, ১১. যমরাজ, বিশেষণে ,যষ্টিধারী, আগাগোড়া মূল্য, ১৩. চর্বি, মেদ, ১৫. দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র, ১৭. লেবু সমার্থে দশ মহাবিদ্যার অন্যতম, ১৮. "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ —"।

উপর-নীচ ঃ ১. সূর্য, আগাগোড়া ওজন, ২. লক্ষ্মীন্দর-এর নামের কথ্য রূপ, ৩. গর্ন্ধবরাজ বিশ্বাবসুর পুত্র, তিনি ইন্দ্রের সভাসদ এবং সঙ্গীত ও নৃত্য বাদ্যাদির নায়ক ছিলেন —, ৬. কল্পান্তজীবী মুনি, প্রথম দুয়ে এক ওয়া ক্রিকেটার, ৮. স্ত্রীলোকের নৃত্য, ১০. অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে দংশনকারী সাপবিশেষ, অষ্ট নাগের অন্যতম ১২. দই, খই কড়মা ইত্যাদি দিয়ে মাঙ্গলিক কাজের জন্য প্রস্তুতি ভোগ বিশেষ, ১৪. গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি কলা বিভাগের যে শাস্ত্রে আছে, ১৬. ধূর্ত, চালাক।

সমাধান শব্দরূপ ৫০১

সঠিক উত্তরদাতা

শান্তনু গুড়িয়া
বাগনান, হাওড়া।
শৌণক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭

ম	হি	যা	সু	র	■	ক	শা
■	■	■	রা	জ	কু	মা	র
অ	■	■	সা	■	■	■	দো
কা	■	ম	র	■	ম	হ	ৎ
ল	ব	ন	■	অ	ণু	■	স
বো	■	■	■	ব	■	■	ব
ধ	র	ণী	সু	তা	■	■	■
ন	ম	■	ধা	র	ণা	তী	ত

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২০ এপ্রিল ২০০৯ সংখ্যায়।

‘আমি ভারতীয় হিন্দু বলে গর্বিত’
সাবাস বাপের বেটা বরুণ গান্ধী

শিবাজী গুপ্ত

সেকুলারিজম মনে হচ্ছে যমের বাবা। দেশের সব কটা হিন্দুকে হিজড়ে বানিয়ে দিয়েছে। পাড়ার পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট, এমনকী সাব ডিভিশনাল কোর্ট থেকে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট অবধি সেকুলারিজম ব্যাধিতে আক্রান্ত কোনও হিন্দুর মুখ থেকে কোনও কথা খসা মাত্রই সে কথায় সেকুলার সতীর শ্লীলতাহানি হল কি না তা জানবার জন্য সবাই উৎকর্ণ হয়ে থাকে। রামায়ণ-মহাভারতেও সীতা-সাবিত্রীর চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করা হয়ে থাকে হরদম, কিন্তু সতী সেকুলারিজমের চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ নৈব নৈব চ। করলেই আটক -ফাটক জেল-জরিমানা ইত্যাদি নানাবিধ শাস্তির খাঁড়া ঝুলে আছে।

কিন্তু দেশের সব হিন্দু পুরুষ যে ভেড়ুয়া বনে যায়নি তার প্রমাণ দিলেন বিজেপি’র উঠতি নেতা বরুণ গান্ধী — জন্মসূত্রে প্রপৌত্র ফিরোজ গান্ধীর নাতি। বরুণের পিতা সঞ্জয় গান্ধীর আববাজান ফিরোজ গান্ধীর শ্বশুর নেহরু হিন্দু জাতিকে পঙ্গু ও নির্বীর্য করতে, ইসলাম ও খৃস্টান ধর্মের ভিত্তি জোরদার করতে সেকুলারিজম পয়দা করলেন এবং তার কন্যা মুসলমান ঘরণী ইন্দিরা তাকে সংবিধানে ঢোকালেন। তারপর থেকে সেকুলার সতীর এতো স্বামী বা খসম জুটেছে যে, সেটি এখন আর একজনের রক্ষিতা নয়। বহুভর্তৃকা নারীর দশা হয়েছে সেকুলার সতীর। সবাই তার সতীত্ব রক্ষায় দলবদ্ধ। সেকুলারিজমের নামে ক্রমাগত যে মুসলিম ও খৃস্টান তোষণ চলছে, বরুণ গান্ধী তার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তার পরিণতিতে সংখ্যাগুরু হিন্দুরা আজ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত। তাদের কোনও স্বকীয় ও স্বীকৃত সত্তা নেই। লক্ষণরেখার মতো তাদের জীবন গণ্ডীবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তার চারদিকে সেকুলারিজমের কাঁটাতারের বেড়া। হিন্দু খুন হোক খুনী মুসলমানের নাম বলা যাবে না। হিন্দুর ঘর-বাড়ি পোড়া যাক, দোকানপাট লুণ্ঠিত হোক, দুস্কৃতী মুসলমানের নামোল্লেখ করা যাবে না। হিন্দু নারী অপহৃত হোক, তার ইজ্জতহানি করা হোক, শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার্থে ধর্ষক বা বলাৎকারীর নামোল্লেখ নিষিদ্ধ। পঞ্চায়েত থাকবে নিরপেক্ষ, থানা থাকবে নিষ্ক্রিয়, কোর্ট কাছারী নির্বাক; কারণ সেকুলার রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুর সাতখুন মাপ।

হিন্দুর মন্দির পুড়িয়ে দিক, দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙা হোক তার প্রতিকার নেই। সাধারণের রাস্তা দিয়ে প্রতিমা আনা বা বিসর্জন দেওয়া চলবে না। মুসলমানরা দয়া করে অনুমতি দিলে তবেই দেবমূর্তি আহ্বান ও বিসর্জন চলবে। নচেৎ নট। আর মুসলমানরা যত্রতত্র গাড়িঘোড়া বন্ধ করে নামাজ পড়ুক, মনের খুশে গো-কোরবানি করুক, তার দু’এক টুকরো হিন্দু মন্দিরে ফেলে দিক, তা নিয়ে উচ্চবাচ্য চলবে না। কারণ মুসলমানরা সেকুলার সতীর বিবি, তার ইজ্জৎ রক্ষায় দশ-বিশজন সেকুলার সোয়ামী বা খসম এক পায়ে খাড়া। পাতাটি নড়লেই হিন্দুদের দিকে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসবে।

নেহরু-গান্ধী কুরুকুলে দেখা যাচ্ছে বরুণ গান্ধীই একমাত্র বিকর্ণের ভূমিকায়। কুরু রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একমাত্র বিকর্ণই প্রতিবাদ করেছিল। আর সমস্ত বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধের দল দুর্যোধনের অন্নদাস হবার নিমিত্ত বর্বরোচিত কাজের নিন্দা করার সাহস পাননি। তাই ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধনাদি শতপুত্র নিহত হলে যুধিষ্ঠির একমাত্র বিকর্ণের জন্যেই বিলাপ করেছিলেন। আর বর্তমানে কংগ্রেসী দুঃশাসনে অপহৃতা লাঞ্ছিতা হিন্দু নারীদের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলার জন্য সেকুলার বাহিনীর মধ্যে একটি লোক নেই। সবাই যেন মুসলমানদের সগোস্ত বিরিয়ানি দাস বনে গেছে।

বরুণ গান্ধী এমনকী অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন কথা বলেছেন যে তার বিরুদ্ধে সমগ্র সেকুলার সারমেয় কুল মুক্ত কচ্ছ হয়ে মাঠে নেমে পড়েছে? কুকুরের পেটে যেমন ঘি হজম হয় না, তেমনি সেকুলারদের কানেও সত্য, ন্যায্য কথা মধুর ঠেকে না।

সংবাদপত্রের ভাষ্য থেকে জানা যায় — “মানেকা তনয় (বরুণ) জানিয়েছেন, একটি সম্প্রদায় যখন কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, তখন তিনি চেষ্টা করেছিলেন তাদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে। এবং দেশের মানুষকে এই কাজে তাঁর পাশে দাঁড়ানোরও আর্জি জানিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, পিলিভিটে হিন্দুরা ত্রাসের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তিনটি ব্লকে হিন্দুদের মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানেই তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন। জানিয়েছেন, পিলভিট একটি স্পর্শকাতর সীমান্ত এলাকা। ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সেখানে অস্ত্র পাচার হচ্ছে। তিনি জানান বহু বাড়িতেই এখনও গরু জবাই করা হয়। এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।”

বরুণ গান্ধী যা বলেছেন, তা প্রত্যেকটি হিন্দুর মর্মকথা। তিনি যা বলেছেন, তা যদি সাম্প্রদায়িক হয়, তা হলে স্বামী বিবেকানন্দ সবচেয়ে বড় সাম্প্রদায়িক। দেশভাগের পাপে ও অপরাধে যখন মুসলমান সম্প্রদায় সিঁটিয়ে ছিল, তখন মুসলিম সংস্কৃতির ধারক-বাহক নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষতা মুসলমানদের নির্জীব দেহে তাগদ সঞ্চার করে। ভারতের মুসলিম জাতির প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থা জামাত-ই-ইসলামী ও মৌলভীরা তাই নিঃসঙ্কোচে বলতে পারে —“আমরা চাই রাষ্ট্র হবে ধর্ম নিরপেক্ষ;কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা হতে মুসলমানদের অব্যাহতি দেওয়া হোক।” মুসলমানরা নিজেদের ধর্মীয় স্বাধীনতা পুরাপুরি ভোগ করবে, কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মাচরণ সহ্য করবে না — এই হল সেকুলারিজমের মর্মকথা। এই সেকুলারিজমের প্রশ্রয় পেয়েই মুসলমানরা সাপের পাঁচ পা দেখেছে। মেকী সেকুলারিজম হিন্দুজাতিকে স্লো-পয়জনের মতো ধ্বংস করছে। জঙ্গি হিন্দুত্ব প্রয়োগে সেকুলারিজমকে ধ্বংস করাই প্রত্যেকটি হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য।

ভারতীয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সমাজের সার্বিক বিকাশে স্বাস্থ্য এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভারতীয় হোমিওপ্যাথি সমাজ সেদিকেই লক্ষ্য রেখে কাজ করে চলেছে বলে মন্তব্য করলেন শিক্ষাবিদ ডাঃ সত্যব্রত সিংহ। গত ২২ মার্চ কলকাতা কেশব ভবনে ভারতীয় হোমিওপ্যাথি সমাজ আয়োজিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলনের উদ্বোধন করতে এসে তিনি এই মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, হোমিওপ্যাথির জনক হ্যানিম্যান হলেও, দর্শনগত দিক থেকে বেদান্তের সঙ্গে মিল রয়েছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে প্রকৃত হোমিওপ্যাথিরও বিকৃতি হচ্ছে বলে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

ভারতমাতা ও মহাত্মা হ্যানিম্যানের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। অন্যান্যদের মধ্যে এদিন পুস্পার্ঘ্য নিবেদন করেন হোমিওপ্যাথি সমাজের সভাপতি ডাঃ সুকুমার মন্ডল, সহ সভাপতি ডাঃ পার্থ কুন্ডু এবং কোষাধ্যক্ষ ডাঃ জয়দেব কুন্ডু প্রমুখ।

প্রাস্তবিক ভাষণে ডাঃ জয়দেব কুন্ডু ১৯৮৪ সাল থেকে ধীরে ধীরে এই সংগঠনের বিকাশের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। একই সঙ্গে বিশুদ্ধ হ্যোমিওপ্যাথির বদলে আজকাল হোমিও কলেজগুলিতে সস্তায় বাজিমাত করতে এলোপ্যাথির দ্বারস্থ হচ্ছে বলে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এর ফলে রোগ নির্মূলের ক্ষেত্রে সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় এক’শো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সারাদিন ধরে সাংগঠনিক আলোচনা ছাড়াও রোগ ও রোগীর অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বিশেষ অধিবেশনে ‘শিশুদের যথার্থ লালন’ পালনে মায়েদের ভূমিকা শীর্ষক বিষয়টি ডাঃ সুকুমার মন্ডল গভীর ভাবনার সঙ্গে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। আলোচনায় শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগে মায়েদের করণীয় দিকগুলি সম্পর্কে আধুনিক শিশু চিকিৎসক, বিজ্ঞানী প্রমুখদের গবেষণার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা-ভাবনার সাযুজ্য তিনি তুলে ধরেন। এরই সঙ্গে তিনি হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে সরল সমাধানের বিষয়টি প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেন।

গর্ভাবস্থায় মায়েদের আচার-আচরণ এবং খাদ্যাভ্যাস ঠিক ঠিক করলে ভূমিষ্ঠ শিশুর অনেক রোগজ্বালার সম্ভাবনা যে নির্মূল হয়ে যায় সে ব্যাপারেও তিনি বক্তব্য রাখেন। সুস্বাস্থ্য ও সুষ্ঠু সমাজ গঠনে ভারতীয় হোমিওপ্যাথি সমাজ আরও বেশি সক্রিয় হবে বলে এদিন শতাধিক চিকিৎসক অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

শোক সংবাদ

বর্ধমানের কালনা নগরের স্বয়ংসেবক অমরেশ পাল ও আনন্দ পালের পিতৃদেব রমেশ পাল গত ৭ মার্চ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি দুই পুত্র সহ নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন।

✪ ✪ ✪

বর্ধমানের কালনা নগরের স্বয়ংসেবক সোমনাথ ভট্টাচার্যের পিতামহ বাসুদেব ভট্টাচার্য গত ১৪ ফেব্রুয়ারি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি মহিষমর্দ্দিনী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ছিলেন। সংস্কৃতে পান্ডিত্যের জন্য তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি দুই পুত্র, দুই কন্যা ও নাতি-নাতনীদের রেখে যান।

মঙ্গলনিধি

সঙ্ঘের বসিরহাট জেলার সহ বৌদ্ধিক প্রমুখ সুভাষচন্দ্র নাথ তাঁর একমাত্র মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সমাজের অবহেলিত মানুষের সেবার জন্য পাঁচ হাজার এক টাকা মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশব দীক্ষিত এই মঙ্গলনিধি গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রচারক রমাপদ পাল, প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ অশোক সাহা, উত্তর ২৪ পরগণা বিভাগ প্রচারক বুদ্ধদেব মণ্ডল, বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সংগঠন সম্পাদক অলোক চ্যাটার্জি, প্রাক্তন জেলা কার্যবাহ সুভাষচন্দ্র নন্দী, বসিরহাট জেলা প্রচারক কর্ণধর দে সহ অনেকে এদিন উপস্থিত ছিলেন।

❖ ❖ ❖

সঙ্ঘের বসিরহাট জেলার গন্ধর্বপুর শাখার স্বয়ংসেবক কৌশিক সরকারের বিবাহ উপলক্ষে গত ১৩ মার্চ প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে বসরিহাট জেলার সীমান্ত জনকল্যাণ সমিতির প্রমুখ যতীন সমাদ্দারের হাতে সমাজের সেবা কাজের জন্য নগদ ৫০১ টাকা মঙ্গলনিধি প্রদান করেন কৌশিকের মা অঞ্জলি সরকার। এই অনুষ্ঠানে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের সংগঠন সম্পাদক অমল কুমার ঘোষ এবং বসিরহাট জেলা কার্যবাহ সুকুমার বৈদ্য এবং গন্ধর্বপুর মহকুমা শারীরিক প্রমুখ নারায়ণচন্দ্র দাশ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

❖ ❖ ❖

আসানসোল জেলার রূপনারায়ণপুর কেবলস্ নগর কার্যবাহ রাম নরেশ সিংয়ের পুত্র রামদাসের বিবাহ উপলক্ষে গত ৬ই মার্চ তাঁর বাড়িতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক হাজার এক টাকা মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। সঙ্ঘের আসানসোল জেলা কার্যবাহ বিপ্লব রায়, বৌদ্ধিক প্রমুখ যুগল কিশোর সিং, সেবা প্রমুখ প্রলয় চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন মহকুমা কার্যবাহ প্রদীপ কুমার সিং এবং চিত্তরঞ্জন নগর কার্যবাহ অভিজিৎ মজুমদার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জেলা সেবা বিভাগের পক্ষ থেকে নব বর-বধূকে একটি তামার ‘মঙ্গল ঘট’ প্রদান করা হয়।

Swastika
6 April - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

পশ্চিমবঙ্গে জোটের রাজনীতি

(৩ পাতার পর)

এটা ঠিক যে, এস ইউ সি আই তাকে চায় না। কিন্তু ওই দল তো কংগ্রেসকেও চায়নি — এমনকী, কংগ্রেস-তৃণমূল জোট হওয়ার পরেও জয়নগর ছাড়াও নয়টা কেন্দ্রে তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সি পি আই (এম)-কে হঠানোর জন্য এস ইউ সি, এই জোটে থেকে গেছে। এই দলের নেতাদের বোঝানো যেত না যে, বিজেপি-র সঙ্গে আঁতাত হবে না — শুধু হবে আসন রফা যাতে মেকী বামদের একটা বড় ধাক্কা দেওয়া যায়?

কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা — এতে কি ভোট-ভাগাভাগিটা পুরোপুরি ঠেকানো যাবে? সোমেন মিত্র বা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরাগীদের সবাই কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দেবেন? তৃণমূলের সব সমর্থক দীপা দাসমুন্সী বা প্রণব মুখার্জীকে মেনে নেবেন? তাছাড়া সাধারণ মানুষ — যাঁরা সি পি আই (এম)-এর অত্যাচার অন্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত, তাঁরা তাঁদের এলাকার কংগ্রেস প্রার্থীকে মেনে নিতে পারবেন ভোটের সময়?

সিঙ্গুর আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নিবন্ধ লিখে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি কি সি পি আই (এম) এর সঙ্গে যুক্ত? জিজ্ঞেস করি — তাহলে বিজেপি কোনও আসনে প্রার্থী দিতে পারবে না? কি কারণে?

মুসলিম ভোট হারানোর ভয়ে তৃণমূল তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। রাহুল সিন্‌হা মঞ্চে থাকায় মমতা ব্যানার্জী গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে এসেছেন। কিন্তু মুসলিম ভোটারদের কি বোঝানো যেত না যে, তাঁর বিজেপি প্রীতি নেই, তাঁর হিন্দুত্ব তত্ত্বেও আগ্রহ নেই — একমাত্র লক্ষ্য হল সি পি আই (এম) কে তাড়ানো?

এভাবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে? জানি না।

তৃণমূল নেতৃত্ব যদি আর একটু সহনশীল, উদার ও বাস্তববাদী হত, তাহলে বৃহত্তর একটা বাম-বিরোধী মঞ্চ তৈরি করা যেত। কেন্দ্রে কংগ্রেস কুড়িটা দলকে নিয়ে ইউ পি এ সরকার তৈরি করেছে — তাদের সবাই কি সমমতাবলম্বী? সি পি আই (এম) কোথাও বিজেপি-র সঙ্গে, কোথাও নকশালদের সঙ্গে, আবার কোথাও মুসলিম লীগের কোনও অংশের সঙ্গে আঁতাত করেছে ক্ষমতা দখলের স্বার্থে। এদেশে এমনটাই হয়।

তৃণমূলের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল সমস্ত সি পি আই (এম) বিরোধীদের সঙ্গে রফা করা — আঁতাত না হলেও আসনের ব্যাপারে একটা সাময়িক সমঝোতা করা। তাহলেই মনে হয় মেকী বামেদের এই রাহুগ্রাস থেকে পশ্চিমবঙ্গকে মুক্ত করা যেত।

স্বামী পূর্ণানন্দ মহারাজকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন অমর মুখোপাধ্যায়।

ভারত বিকাশ পরিষদের রামায়ণ নিয়ে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভারত বিকাশ পরিষদের বালিগঞ্জ শাখার উদ্যোগে সম্প্রতি এক মনোজ্ঞ আলোচনা চক্র হয়ে গেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার্সের প্রেক্ষাগৃহে। আলোচনা চক্রের বিষয় ছিল রামায়ণ ও তার চিরন্তন আবেদন। অবক্ষয়িত, দুর্নীতি ও দুবৃর্ত্তায়ণের পাঁকে জড়িয়ে ক্রমক্ষয়িষ্ণু এই সমাজ ব্যবস্থায় রামায়ণের ভাব ও বাণীর তাৎপর্য অনুধাবন করা ও সুস্থ সমাজ গঠনের নিমিত্ত তা সার্বিকভাবে অনুসরণ করা— এই ছিল সেমিনারের প্রত্যেক বক্তার বক্তৃতার প্রতিপাদ্য।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী স্বামী পূর্ণানন্দ মহারাজ। তার কণ্ঠাশ্রিত কথামৃতের গান বিশেষ মাত্রার সঞ্চার করে। সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সত্যানিষ্ঠা ও সুশাসনের কথা তুলে ধরেন। এছাড়া দুই বিদগ্ধ বক্তা সত্যবতী গিরি ও কানন বিহারী গোস্বামী রামায়ণের প্রাসঙ্গিকতা ও তার কালজয়ী চিরন্তন প্রভাবের কথা ব্যক্ত করেন। দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে রামায়ণের গুরুত্বপূর্ণ সব অভিজ্ঞান ও প্রধান চরিত্র ভগবান রামচন্দ্রের আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রনীতির সাপেক্ষে সামাজিক কর্মকান্ডের প্রভাব নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

সংগঠনের তরফে বক্তব্য রাখেন অমর মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়, পুরুষোত্তম দাস ভূত ও সম্পাদক তপতী মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন অমিতাভ মুখোপাধ্যায়।

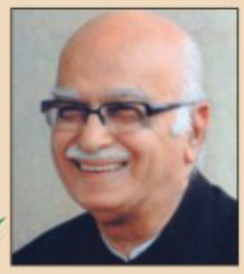

শ্রীরামপুর লোকসভার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী

ডঃ দেবব্রত চৌধুরীর পরিচিতি

ডঃ দেবব্রত চৌধুরী হুগলী জেলার বাসিন্দা। ডঃ চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এস সি (টেক) পাশ করে ইংলন্ডের ম্যানচেষ্টারে অবস্থিত **Textile institute** থেকে **Textile Engineering & City & Gild of London Institute** থেকে **Jute Technology** পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। পরবর্ত্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে **B.A (Eco)** পাশ করে পরে **MBAÂ** পাশ করেন। পরে দিল্লী থেকে **Industrial Management** পাশ করে **Management** নিয়ে **Ph.d** করেন। রাষ্ট্রসংঘ থেকে এক আর্ন্তজাতিক মেধাবৃত্তি পেয়ে **Asian productivity Organisation (APO),** জাপান থেকে **Production Management** পাশ করে পরবর্ত্তীকালে **Institution Of Engineers** থেকে **Fellomembership** পান এবং **Chartered Engineer** হন ও **Indian institute of Production Engineering** এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান হন (১৯৯১)। বর্ত্তমানে **India Soceity of Engineers** সংস্থার সাধারণ সম্পাদক পদে আসীন আছেন ড দেবব্রত চৌধুরী মহাশয়।

প্রথম জীবনে এক বৃটিশ ফার্মে উচ্চপদে যোগদান করেন, পরবর্ত্তীকালে ভারত সরকারের **Ministry of Textile** বিভাগে এক উচ্চপদে যোগদান করে ধীরে ধীরে **Chief Manager** পদে উন্নীত হন। ১৯৯১ সালে ভারতের এক মিশনের **Convenor** হয়ে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে রাশিয়া (USSR) যান। ১৯৯১ সালেই তার কর্মকুশলতায় ও দেশ সেবার জন্য জাতীয় একতা পুরস্কারে (National Unity Award) ভূষিত হন। সেই বছরেই ওঁর সাথে মাদার টেরিজা, সত্যজিৎ রায়, রুশী মোদী ও ভারতের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই পুরস্কারে সম্মানিত হন। কয়েক 'শো আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার জন্য ১৯৯৪ সালে ডঃ চৌধুরীকে 'কবি কালিদাস' পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০০৫ সলে **International Publishing House, Delhi** ডঃ চৌধুরী কে **"Best Citizen of India-2005"** ঘোষণা করেন। ১৯৯২-৯৬ সাল পর্যন্ত ডঃ চৌধুরী রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠের শিল্প শিক্ষা মন্দিরের সাথে **Vice Chairman** হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯২-৯৩ সালে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্ট ডঃ চৌধুরীকে **Engineer Commissioner** হিসাবে নথীভুক্ত করে। কার্য ব্যাপদেশে ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশ ও বিদেশেও অনেক জায়গায় ভ্রমণ করে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন ডঃ চৌধুরী। ২০০৭ সালে **International Human Right Protection Association** ডঃ চৌধুরীকে তাদের পশ্চিমবঙ্গ শাখার **President** হিসাবে নির্বাচিত করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন **India Institute of Public Administration** তাদের পঃবঙ্গ শাখা ড. দেবব্রত চৌধুরীকে **Vice President** হিসাবে নির্বাচিত করেন ২০০৮ সালে।

ডঃ চৌধুরী ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন ১৯৯১ সালে। প্রথমে কার্যকারী সমিতির সদস্য পরবর্তীকালে সম্পাদক, পরে সাধারণ সম্পাদক এবং শেষে তিনবার দলে সহ-সভাপতি হন।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের জন্য প্রযুক্তিবিদ্, শিক্ষাবিদ, দেশহিতৈষী ও মানবদরদী ডঃ দেবব্রত চৌধুরীকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন এবং আশা রাখেন ডঃ চৌধুরীকে জয়ী হওয়ার জন্য আশীর্ব্বাদ করবেন স্থানীয় জনগণ পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে।

দিন যায়, রাত্রি আসে-
তবে দুঃস্বপ্নের রাত্রি
গরু-পাচার থেকে
ভরু-পাচার
নিরুদ্দেশ থেকে অনুপ্রবেশ
সন্দেহ থেকে সন্ত্রাস

স্বস্তিকা
নববর্ষ সংখ্যা
১৪১৬
প্রকাশিত হবে
১৩ এপ্রিল '০৯

পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গ্রামগুলি আজ আর ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় নয় হিন্দুদের কাছে। কেন? হিন্দু সংগঠনগুলোই বা কীভাবে বল ভরসা জোগাচ্ছে — কেবল আলোচনার বিশ্লেষণ নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব, অন্তরের অনুভব —

"সীমান্তের গ্রাম"

লিখেছেন ঃ- স্বামী বেদানন্দ, বাণীপদ সাহা, সত্যানন্দ গুহ, তরুণ পণ্ডিত, সন্তোষ সরকার, প্রাণপ্রতিম পাল, উদয় সরকার, বরুণশঙ্কর ঠাকুর, রবিকিঙ্কর ঘোষ, রমাপদ পাল প্রমুখ।
সব মিলিয়ে এক সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা

।। রঙিন প্রচ্ছদ। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।।
।। দাম ছয় টাকা।।
৩১ মার্চের মধ্যে এজেন্টরা কপি বুক করুন।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com